হিফয করার পদ্ধতি ও আদর্শ হিফয বিভাগ

[বাংলা– Bengali – بنغالي]

সানাউল্লাহ নজির আহমদ

2014-1435

IslamHouse.com

﴿ طرق التحفيظ والحلقة النموذجية للتحفيظ ﴾

« باللغة البنغالية »

ثناء الله نذيرأحمد

2014 - 1435

IslamHouse.com

সূচীপত্র

শুরুর কথা

এক-সময় শুধু মাদ্রাসাতে কুরআনুল কারিম হিফয করা হত, স্কুলে তার কল্পনা করা ছিল দিবাস্বপ্নের ন্যায়। বর্তমান যদিও সরকারী স্কুল-কলেজের অবস্থা তথৈবচ, তবে প্রাইভেট অনেক স্কুল-কলেজ হয়েছে, যেখানে ফুল টাইম, হাফ টাইম ও খণ্ডকালীন বিভিন্ন পদ্ধতিতে কুরআনুল কারিম হিফয করানো হয়। এ ক্ষেত্রে বাংলা মাধ্যম, ইংলিশ মিডিয়াম ও ইংরেজি ভার্সন কেউ কারো থেকে পিছিয়ে নেই। এটা পরিচালকদের দীনি চেতনা, দীনকে বিজয়ী করার অভিপ্রায় ও বাতিলকে পরাজিত করার দীপ্ত প্রত্যয়ের বহিঃপ্রকাশ সন্দেহ নেই। আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্য সফল করুন। তাদের কেউ হিফয বিভাগ পরিচালনা, হিফয করার পদ্ধতি ও হিফয শাখার আনুষঙ্গিক বিষয়ে সমস্যার সম্মুখীন হোন।

দীনদার অনেক ভাই, সহি আকিদা, দীনের সঠিক বুঝ ও হিদায়েত লাভ করার পর কুরআনুল কারিম হিফয করার মহান ব্রত গ্রহণ করেন, এটা তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু হিফয করার সঠিক পদ্ধতি না জানার কারণে কাঙ্ক্ষিত সফলতা থেকে বঞ্চিত হন।

অসংখ্য প্রবীণ মুসলিম, যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত সালাত আদায় করছেন মাত্র পাঁচটি কিংবা দশটি সূরা দিয়ে, তাও অশুদ্ধ ও ভুলে

ভরা। ষাট বা সত্তর বছরে উন্নীত হয়েছেন কিন্তু কুরআনুল কারিমের কোনো উন্নতি হয়নি, নতুন কোনো সূরা মুখস্থ করার প্রয়োজন অনুভব করেননি, কিংবা তার প্রেরণা পাননি, ফলে দুনিয়া-আখিরাতের প্রচুর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত তিনি।

মাদ্রাসা পড়ুয়া অনেক আলেম আছেন, যারা দশ-বিশটা সূরার বেশী মুখস্থ জানেন না, যদিও দশ বা বারোটা বছর দীন শিক্ষার কেন্দ্র মাদ্রাসায় ব্যয় করেছেন, কিন্তু কুরআন হিফয করার অনুপ্রেরণা কিংবা তার পরিবেশ তিনি পাননি। কতক ইমাম আছেন মাত্র কয়েকটি সূরা দিয়ে জীবন-ভর ইমামত করছেন, একটি সূরা একাধিক সালাতে বারবার পড়ছেন, প্রচুর সময় ও অবসরতা থাকা সত্যেও এক-পারা, দুই-পারা কিংবা তিন-পারা মুখস্থ করার সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেননি![1]

প্রচলিত হিফয খানায় সঠিক নির্দেশনা, উপকারী সিলেবাস ও দক্ষ পরিচালনার অভাব প্রকটভাবে। অতএব কুরআনুল কারিম ও তার শিক্ষার কেন্দ্রগুলো অবহেলার শিকার একভাবে নয়, বিভিন্নভাবে। কোনো বিবেচনায় হাফিযদের সংখ্যা বেশী হলেও, গায়রে-হাফিযদের কুরআনুল কারিমের প্রতি অবহেলা এতো অধিক যে, তাদের ঈমান ও ইসলাম পর্যন্ত প্রশ্নবিদ্ধ!

---

[1] দীনের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে কুরআনুল কারিমের প্রতি এতটা অবহেলা দুর্ভাগ্য বৈ কি?

আমাদের দেশের হাফিয সাহেবদের দীন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়েছে! ফলে কুরআনুল কারিমের মকতব বা হিফয খানাগুলো বিদআত ও কুসংস্কারের আড্ডা, বরং শিরকের পরিচর্যা কেন্দ্রে পরিণত! এ অধঃপতন একদিন কিংবা একদিক থেকে আসেনি, দুঃখজনক হলেও সত্য এ দেশে দীর্ঘ দিন থেকে যারা দীনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের পথ ধরে মুসলিম সমাজে বিদআত, কুসংস্কার, বরং শিরক পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করেছে, যার ফর্দ অনেক দীর্ঘ, অনেক বেদনাদায়ক।

বইটি পড়ে কেউ বিশুদ্ধভাবে কুরআনুল কারিম শিখবে, কেউ সঠিক পদ্ধতিতে হিফয করবে, কেউ হিফযের প্রতি আগ্রহী হবে। হিফযের ময়দানে নবাগত ও হিফয শাখার পরিচালকবৃন্দ সঠিক নির্দেশনা পাবে, প্রচলিত হিফয খানাগুলো কুসংস্কার মুক্ত হবে, হাফিয সাহেবগণ কুরআনুল কারিমের মহত্ত্ব অন্তরে ধারণ করবে, এটাই আমাদের কামনা।

একটি পরিশিষ্ট দ্বারা হাফিয সাহেবদের কতিপয় ভুলভ্রান্তি দূর ও কুসংস্কার মুক্ত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এ জন্য প্রত্যেকটি আলোচনা প্রমাণসহ উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। হে আল্লাহ, আমাদের এ আমলটুকু কবুল করুন এবং আপনার রহমত ও মাগফেরাত দ্বারা আমাদেরকে ঢেকে নিন।

কুরআনুল কারিমের গুরুত্ব

মুসলিম জীবনে কুরআনুল কারিমের গুরুত্ব বলার অপেক্ষা রাখে না। সহি আকিদা, বিশুদ্ধ ইবাদত ও উত্তম আখলাকের উৎস এ কুরআন, এটিই মুসলিমদের জীবন বিধান| এতে রয়েছে আদর্শ সমাজ, সুশৃঙ্খল জাতি ও শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয় উপাদান। মুসলিমরা যদি কুরআনুল কারিমের গুরুত্ব বুঝে তার প্রতি ঈমান নবায়ন করে, তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলে ও তাকে আঁকড়ে ধরে, তাহলে তারা পবিত্র জীবন, রাজনৈতিক দক্ষতা, সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, আদর্শ সমাজ ও প্রচুর নিয়ামত লাভ করবে সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذۡنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ٩٦﴾ [الاعراف: ٩٥]

“যদি জনপদবাসী ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, অবশ্যই আমি তাদের উপর আসমান ও জমিনের বরকত খুলে দিতাম, কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করেছে, ফলে তারা যা উপার্জন করত, তার কারণে আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি”।[1]

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের ন্যায় মুসলিমরা যদি তিলাওয়াত ও হিফয দ্বারা কুরআনকে আঁকড়ে

---

[1] সূরা আরাফ: (৯৬)

ধরে, কুরআন বুঝে ও তার উপর আমল করে, তাহলে তাদের হারানো গৌরব, বিস্মৃত সম্মান ও আকাশ চুম্বী সফলতা ফিরে আসবে অবশ্যই। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الكِتَابِ أَقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخرِينَ». رواه مسلم

“নিশ্চয় আল্লাহ এই গ্রন্থ দ্বারা এক জনগোষ্ঠীর উত্থান ঘটান এবং তার দ্বারা অপর জনগোষ্ঠীর পতন ঘটান।”[1]

বলাবাহুল্য, আমাদের পতনের মূল কারণ কুরআনুল কারিম ত্যাগ করা, কেউ তার বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ত্যাগ করেছি, কেউ তার হিফয ত্যাগ করেছি, কেউ তার উপর আমল করা ত্যাগ করেছি, অতএব আমরা যদি উত্থান ও উন্নতি চাই, তাহলে কুরআনকে আঁকড়ে ধরা ব্যতীত কোনো পথ নেই। সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে সফলতার উচ্চ শিখরে পৌঁছেছেন, আমাদেরকে সে পথ ধরে এগুতে হবে। ইমাম মালিক রহ. বলেন, ওহাব ইবনে কায়সান আমাদের নিকট এসে বসতেন, অতঃপর তিনি না বলে প্রস্থান করতেন না:

إِنَّهُ لا يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا».

“এ উম্মতের শেষাংশ কখনো সংশোধন করতে পারবে না, তবে যে বস্তু তার প্রথমাংশ সংশোধন করেছে তা ব্যতীত”।[2] অতএব

---

[1] মুসলিম: (৮১৭)

[2] মুসনাদুল মুয়াত্তা: (পৃ.২৩৯) লিল হাসান ইবনে আলি আল-জাওহিরি।

মুসলিমরা যদি তাদের পূর্বপুরুষদের ন্যায় কুরআনকে আঁকড়ে ধরে, আল্লাহর সাহায্য তাদেরকে হাত-ছানি দিয়ে ডাকবে, সন্দেহ নেই।

কুরআনুল কারিমের কতক বৈশিষ্ট্য

কুরআনুল কারিমকে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন বিশেষণ দ্বারা গুণান্বিত করেছেন, যা তার মর্যাদা-মহত্ত্ব ও গুরুত্বকে প্রকাশ করে, এখানে তার কয়েকটি গুণ উল্লেখ করছি:

১. 'রূহ': কুরআনুল কারিমকে আল্লাহ তা'আলা 'রূহ' বলেছেন, যা ব্যতীত মানুষ মৃত ও নিশ্চল। তিনি বলেন:

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أَمۡرِنَاۚ مَا كُنتَ تَدۡرِي مَا ٱلۡكِتَٰبُ وَلَا ٱلۡإِيمَٰنُ ٥٢ ﴾ [الشورى: ٥٢]

"অনুরূপভাবে আমি তোমার কাছে আমার নির্দেশ থেকে 'রূহ'কে ওহী যোগে প্রেরণ করেছি; তুমি জানতে না কিতাব কী এবং ঈমান কী"?[1]

অতএব এ আয়াত প্রমাণ করে কুরআনহীন মুসলিম জাতি রূহ বিহীন মানুষের ন্যায় মৃত ও মূল্যহীন।

২. 'নূর': কুরআনুল কারিমকে আল্লাহ তা'আলা 'নূর' বলেছেন, যা ব্যতীত মানব জাতি অন্ধকারে নিমজ্জিত। তিনি বলেন:

[1] সূরা শুরা: (৫২)

﴿ قَدۡ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٞ وَكِتَٰبٞ مُّبِينٞ ١٥ يَهۡدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضۡوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِهِۦ ١٦ ﴾ [المائدة: ١٥، ١٦]

"অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে, আল্লাহ তার দ্বারা তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তার সন্তুষ্টির অনুসরণ করে; এবং তাদেরকে তিনি স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন"।[1] অতএব কুরআনুল কারিম ব্যতীত মুসলিম জাতি পথহারা, দিকভ্রষ্ট ও অন্ধকারে নিমজ্জিত।

৩. 'পথপ্রদর্শক': কুরআনুল কারিমকে আল্লাহ তা'আলা পথ-প্রদর্শক বলেছেন, যা ব্যতীত মানব জাতি পথভ্রষ্ট। তিনি বলেন:

﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي لِلَّتِي هِيَ أَقۡوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٩ ﴾ [الاسراء: ٩]

"নিশ্চয় এ কুরআন এমন একটি পথ দেখায় যা সবচেয়ে সরল"।[2] অতএব কুরআনুল কারিম ত্যাগকারী জাতি সরল পথহীন ও দিকভ্রষ্ট।

৪. 'প্রতিষেধক': কুরআনুল কারিমকে আল্লাহ তা'আলা প্রতিষেধক বলেছেন, যা ব্যতীত মানব জাতি রোগগ্রস্ত। তিনি বলেন:

﴿ قُلۡ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدٗى وَشِفَآءٞۚ ٤٤ ﴾ [فصلت: ٤٤]

---

[1] সূরা মায়েদা: (১৫-১৬)

[2] সূরা ইসরা: (৯)

“বল, এটি মুমিনদের জন্য হিদায়েত ও প্রতিষেধক”।[1] অতএব কুরআন ত্যাগকারী জাতি রোগগ্রস্ত, তারা উন্নতির পথে ও সুস্থ জাতির জন্য বোঝা স্বরূপ।

৫. ‘চিরসত্য’: কুরআনুল কারিমকে আল্লাহ তা‘আলা চিরসত্য বলেছেন, যা ব্যতীত মানব জাতি মিথ্যার আবর্তে নিমজ্জিত। তিনি বলেন:

﴿ وَبِٱلۡحَقِّ أَنزَلۡنَٰهُ وَبِٱلۡحَقِّ نَزَلَۗ ١٠٥ ﴾ [الاسراء: ١٠٥]

“আর আমি তা সত্যসহ নাযিল করেছি এবং তা সত্যসহ নাযিল হয়েছে”।[2] অন্যত্র তিনি বলেন:

﴿وَإِنَّهُۥ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٞ ٤١ لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦۖ تَنزِيلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ ٤٢ ﴾ [فصلت: ٤١، ٤٢]

“আর নিশ্চয় এটি এক মহা সম্মানিত গ্রন্থ, তাতে বাতিল প্রবেশ করতে পারে না, না সামনে থেকে, না পিছন থেকে। প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিতের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত”।[3]

অতএব কুরআনুল কারিমের ধারক রূহের অধিকারী তাই তিনি জীবিত, আলোর অধিকারী তাই তিনি আলোকিত, পথপ্রদর্শকের

---

[1] সূরা ফুসসিলাত: (৪৪)

[2] সূরা ইসরা: (১০৫)

[3] সূরা ফুসসিলাত: (৪১-৪২)

অধিকারী তাই তিনি সুপথপ্রাপ্ত, প্রতিষেধকের অধিকারী তাই তিনি সুস্থ, চিরসত্যের অধিকারী তাই তিনি মিথ্যা থেকে মুক্ত।

কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করার ফজিলত

১. আবু উমামাহ বাহেলি রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«اقْرَؤُوا القُرْآنَ ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ». رواه مسلم

"তোমরা কুরআন পাঠ কর, কারণ কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে আগমন করবে।"[1]

২. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ، لَهُ أَجْرَانِ».

"কুরআনুল কারিমে পারদর্শী ব্যক্তি পুণ্যবান সম্মানিত মালায়েকাদের সঙ্গী। আর যে কুরআন পাঠ করে ও তাতে তোতলায়, এমতাবস্থায় যে কুরআন তার উপর কষ্টকর, তার জন্য রয়েছে দু'টি সওয়াব।"[2]

---

[1] মুসলিম: (৮০৭)

[2] সহি বুখারি: (৪৯৩৭), মুসলিম: (৭৯৮)

৩. আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ: رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ: لارِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِيْ يَقرَأُ القُرآنَ كَمَثلِ الرَّيحَانَةِ: رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثلِ الحَنْظَلَةِ: لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ». متفقٌ عَلَيْهِ

"কুরআন পাঠকারী মুমিনের উদাহরণ হচ্ছে উতরুজ্জার[1] উদাহরণ; যার ঘ্রাণ উত্তম এবং তার স্বাদও উত্তম। আর যে মুমিন কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে খেজুরের উদাহরণ; যার কোনো ঘ্রাণ নেই, তবে তার স্বাদ সুমিষ্ট। আর কুরআন পাঠকারী মুনাফিকের উদাহরণ হচ্ছে রায়হানের[2] উদাহরণ; যার ঘ্রাণ উত্তম, তবে তার স্বাদ তেতো। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে মাকাল ফলের উদাহরণ; যার ঘ্রাণ নেই, আর তার স্বাদও তেতো।"[3]

৪. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেন,

---

[1] কমলা লেবুর ন্যায় এক জাতীয় ফল।

[2] সুগন্ধিময় এক প্রকার গাছ।

[3] সহি বুখারি (৫০২০), (৫৪২৭), (৫০৫৯), (৭৫৬০), মুসলিম (৭৯৭)

«ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده». رواه مسلم.

“কোনো কওম আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত ও পরস্পরের মাঝে তার পর্যালোচনার জন্য আল্লাহর ঘরসমূহ থেকে একটি ঘরে যখন জড় হয়, তাদের উপর সাকিনা নাযিল হয়, তাদেরকে রহমত ঢেকে নেয়, মালায়েকাগণ তাদেরকে ঘিরে নেয় এবং আল্লাহ তাদের আলোচনা করেন যারা তার নিকট আছে তাদের সামনে”।[1]

৫. কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করার ফলে সাওয়াব বর্ধিত ও গুনাহ মাফ হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩ لِيُوَفِّيَهُمۡ أُجُورَهُمۡ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّهُۥ غَفُورٞ شَكُورٞ ٣٠ ﴾ [فاطر: ٢٩، ٣٠]

“নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি যে রিযক তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে সদকা করে, তারা এমন এক ব্যবসার প্রত্যাশা করছে, যা কখনো ধ্বংস হবে না, আল্লাহ তাদেরকে

[1] মুসলিম: (২৬৯৯)

তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণ দিবেন এবং তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে বাড়িয়ে দিবেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী”।[1]

কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করার আদব

কুরআনুল কারিম আল্লাহ তা‘আলার কালাম, আল্লাহ মহান তার কালামও মহান। তার কালাম তিলাওয়াত করার সময় যদি তার মহত্ত্ব-মর্যাদা ও আদব রক্ষা করা হয়, তাহলে তিলাওয়াত হবে বরকতময়, সাওয়াবের অধিকারী ও তার সন্তুষ্টির জিম্মাদার। হিফয-খানার শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশী কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করেন, তাই এখানে তার কতিপয় আদব উল্লেখ করছি:

১. বিশুদ্ধ নিয়তে তিলাওয়াত করা: একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা, কারণ যে তিলাওয়াত দ্বারা তার সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয় না, সে তিলাওয়াত তিনি গ্রহণ করেন। তিনি বলেন:

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ۝٥﴾ [البينة: ٥]

[1] সূরা ফাতির: (২৯-৩০)

“আর তাদেরেকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তারই জন্য দীনকে (ইবাদতকে) একনিষ্ঠ করে”।[1] নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ».

“নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কোনো আমল কবুল করেন না, তবে তা ব্যতীত যা শুধু তার জন্য এবং যার দ্বারা তার সন্তুষ্টি হাসিল করা হয়েছে”।[2] অতএব আল্লাহর সন্তুষ্টি, তিলাওয়াতের সওয়াব ও কুরআনুল কারিমকে আঁকড়ে ধরার নিয়তে তিলাওয়াত করা, তাতে সুনাম-সুখ্যাতিকে প্রশ্রয় না দেওয়া।

২. তিলাওয়াতের শুরুতে অযু ও মিসওয়াক করা: পবিত্র অবস্থায় কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা একটি বিশেষ আদব। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».

---

[1] সূরা বাইয়্যিনাহ: (৫)

[2] নাসায়ি: (৩১৪০), আলবানি রহ. সহি হাদিস সমগ্রে হাদিসটি সহি বলেছেন: (৫২)

“পবিত্র সত্তা ব্যতীত কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না”।[1] যদিও কতক আলেম বলেন অযু ব্যতীত কুরআনুল কারিম স্পর্শ করা বৈধ, তারাও বলেন তিলাওয়াতের শুরুতে অযু করা উত্তম।[2] একাধিক সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত মিসওয়াক করা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ এক সুন্নত। তাই মিসওয়াক দ্বারা মুখের দুর্গন্ধ দূরে করে পবিত্র অবস্থায় তিলাওয়াত করা উত্তম, কারণ কুরআন পাঠকারী আল্লাহর সাথে কথোপকথন করেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب».

“মিসওয়াক হচ্ছে মুখ পবিত্র করা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করার বস্তু”। হাদিসটি সহি, তিরমিযি, ইবনে খুজাইমাহ ও ইমাম আহমদর রহ. বর্ণনা করেছেন।

৩. তারতীলসহ তিলাওয়াত করা: তারতীলসহ বা তাজবিদ অনুসরণ করে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা। আল্লাহ তা'আলা বলে:

﴿ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ٤ ﴾ [المزمل: ٤]

---

[1] আত-তাবরানি ফিল কাবির: (১২/৩১৩), আত-তাবরানি ফিস সাগির: (২/২৭৭), হায়সামি রহ. বলেন: এ হাদিস বর্ণনাকারী সকল রাবি নির্ভরযোগ্য। আলবানি রহ.ও হাদিসটি সহি বলেছেন: (৭৭৮)

[2] পরিশিষ্টে এ মাসআলার উপর স্বতন্ত্র প্রবন্ধ দেখুন।

“আর কুরআনকে তারতীলসহ তিলাওয়াত কর”।[1] অপর আয়াতে তিনি বলেন:

﴿وَقُرۡءَانٗا فَرَقۡنَٰهُ لِتَقۡرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكۡثٖ وَنَزَّلۡنَٰهُ تَنزِيلٗا ١٠٦﴾ [الاسراء: ١٠٦]

“আর আমি কুরআনকে নাযিল করেছি কিছু কিছু করে, যেন তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পার ধীরেধীরে এবং আমি তা নাযিল করেছি পর্যায়ক্রমে”।[2]

বিখ্যাত তাবীঈ কাতাদাহ রহ. বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেন: كَانَ يَمُدُّ مَدًّا “তিনি টেনেটুনে পড়তেন”।[3] অতএব তারতীলসহ, মদ-গুন্নাহ ঠিক রেখে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা অন্যতম এক আদব।

৪. তিলাওয়াত করার সময় ক্রন্দন অবস্থার সৃষ্টি করা: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُ ٱلرَّحۡمَٰنِ خَرُّواْۤ سُجَّدٗاۤ وَبُكِيّٗا۩ ٥٨﴾ [مريم: ٥٨]

---

[1] সূরা মুজ্জাম্মিল: (৪)

[2] ইসরা: (১০৬)

[3] বুখারি: (৫০৪৫)

“যখন তাদের কাছে পরম করুণাময়ের আয়াতসমূহ পাঠ করা হত, তারা কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত”।[1] অপর আয়াতে তিনি বলেন:

﴿ قُلْ ءَامِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۩ ﴿١٠٩﴾ ﴾ [الاسراء: ١٠٧، ١٠٩]

“বল, তোমরা এতে ঈমান আন বা ঈমান না আন, নিশ্চয় তার পূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে যখন এটা পাঠ করা হয় তখন তারা সিজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। আর তারা বলে, পবিত্র মহান আমাদের রব! আমাদের রবরে ওয়াদা অবশ্যই কার্যকর হয়ে থাকে। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনিয় বৃদ্ধি করে”।[2] অপর আয়াতে কতক নেককার বান্দার প্রশংসা করে তিনি বলেন:

﴿وَإِذَا سَمِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا۟ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴿٨٣﴾ ﴾ [المائدة: ٨٣]

---

[1] সূরা মারইয়াম: (৫৮)

[2] সূরা ইসরা: ১০৭-১০৯)

“আর রাসূলের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে যখন তারা তা শুনে, তুমি দেখবে তাদের চক্ষু অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে, কারণ তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে”।[1] অতএব তিলাওয়াত শুধু মুখে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্তরকে তার সাথে শামিল করা এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হওয়া।

৫. তিলাওয়াত করার সময় দোয়া করা: রহমত, নিয়ামত ও জান্নাতের আলোচনার সময় আল্লাহর নিকট এসব বস্তু প্রার্থনা করা এবং শাস্তি, গোস্বা ও জাহান্নামের আলোচনার সময় তার নিকট এসব বস্তু থেকে আশ্রয় চাওয়া। হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

«صَلَّى، فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ اسْتَجَارَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنْزِيهٌ لِلَّهِ سَبَّحَ».

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করলেন, যখন তিনি রহমতের আয়াত অতিক্রম করতেন প্রার্থনা করতেন, যখন তিনি শাস্তির আয়াত অতিক্রম করতেন আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, যখন তিনি কোনো আয়াত অতিক্রম করতেন যাতে আল্লাহর পবিত্রতা রয়েছে, তিনি পবিত্রতা ঘোষণা করতেন”।[2]

---

[1] সূরা মায়েদা: (৮৩)

[2] ইবনে মাজাহ: (১৩৫১), হাদিসটি সহি।

৬. তিলাওয়াত করার সময় কৃত্রিমতা ত্যাগ করা: তিলাওয়াতের সময় ভ্রূ কুঁচকানো, কপাল ভাজ করা, মুখ আকা-বাঁকা করা, বড়-বড় হা করা ও কঠিনভাবে হরফ উচ্চারণ করা দোষণীয়।

৭. নিয়মিত তিলাওয়াত করা: কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করার একটি আদব হচ্ছে নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে তিলাওয়াত করা। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتاً مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا». متفقٌ عَلَيْهِ

"এ কুরআন বারবার পড়, সেই সত্তার কসম-যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, রশি থেকে উটের পলায়ন করার চেয়েও কুরআন দ্রুত পলায়নপর।"[1] অপর হাদিসে তিনি বলেন:

«وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ».

"আর নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হচ্ছে যা নিয়মিত হয়, যদিও তার সংখ্যা কম"।[2] অতএব মধ্যপন্থা বজায় রেখে কুরআনুল কারিম নিয়মিত তিলাওয়াত করা এক বিশেষ আদব। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴿١٤٣﴾ ﴾ [البقرة: ١٤٣]

---

[1] মুসলিম: (৭৯২), আহমদ: (১৯০৫২), (১৯১৮৬)

[2] বুখারি: (৫৮৬২), মুসলিম: (৭৮৩)

“আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি”।[1] আমরা মধ্যপন্থী উম্মত, তাই আমাদের তিলাওয়াত হবে মধ্যপন্থী। প্রথম দিন বেশি তিলাওয়াত করে পর দিন তিলাওয়াত না করা মধ্যপন্থার বিপরীত।

৮. বিরক্তিসহ তিলাওয়াত না করা: আগ্রহ নিয়ে তিলাওয়াত আরম্ভ করা এবং বিরক্তি সৃষ্টির আগে তিলাওয়াত বন্ধ করা। জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، فَقُومُوا عَنْهُ».

“তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর যতক্ষণ তার প্রতি তোমাদের অন্তরের আগ্রহ থাকে, যখন তাতে অনাগ্রহের সৃষ্টি হয় তোমরা তার থেকে উঠে পড়”।[2]

৯. দুর্বল হাদিসসমূহ ত্যাগ করা: দুর্বল হাদিসগুলো মানুষকে প্রচুর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে, বিশেষভাবে কুরআনুল কারিমের ক্ষেত্রে। উদাহরণত ফজরের পর সূরা ইয়াসিন ও মাগরিবের পর সূরা ওয়াকি‘আর বিশেষ ফজিলত আমাদের দেশে খুব প্রচলিত, যার স্বপক্ষে দুর্বল হাদিস ব্যতীত কোনো সহি হাদিস নেই। দেখা যায় ফজরের পর সূরা ইয়াসিন ও মাগরিবের পর সূরা

---

[1] সূরা বাকারা: (১৪৩)

[2] সহি ইবনে হিব্বান: (৭৫৯)

ওয়াকি'আহ পাঠকারী কুরআনুল কারিমের অন্যান্য অংশ পড়ার সময় পায় না, তাই বছরের পর বছর দু'একটি সূরায় সীমাবদ্ধ থাকে, ফলে পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করার বরকত থেকে বঞ্চিত হয়। তবে ফজিলতপূর্ণ সূরাসমূহ অবশ্যই পাঠ করা, যেমন সূরা বাকারা, আলে-ইমরান, সূরা কাহাফ, বনি ইসরাইল/ ইসরা, যুমার, মুলক এবং সূরা নাস ও ফালাক ইত্যাদি তাতে এ জাতীয় অনিষ্ট নেই।

১০. তিন দিনের কমে কুরআনুল কারিম খতম না করা: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ».

"তিন দিনের কম সময়ে যে কুরআন খতম করল সে কুরআন বুঝল না"।[1] আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ، فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ فِي ثَلَاثٍ».

"প্রত্যেক মাসে এক খতম কর, তিনি বললেন: আমি অধিক সামর্থ্য রাখি। তিনি কমাতে থাকলেন-অবশেষে বললেন: তিন দিনে খতম কর"।[2] অপর হাদিসে এসেছে:

«فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ».

---

[1] তিরমিযি: (২৯৪৯), তিনি হাদিসটি সহি বলেছেন।

[2] বুখারি: (১৯৭৮)

“সাত দিনে খতম কর, তার অতিরিক্ত কর না”।[1] অর্থাৎ সাত দিনের কম সময়ে কুরআন খতম কর না।

হিফয করার বয়স

ইলমের সফর সবচেয়ে দীর্ঘ, পুরো জীবনের সফর, তার জন্য নির্দিষ্ট বয়স বা সীমা-রেখা নেই। অতএব, কুরআনুল কারিম হিফয করার উপযুক্ত সময় যাই হোক, আল্লাহ যখন বুঝ দান করেন তারপর থেকে কোনো সময় নষ্ট না করা। কারণ, কুরআন সর্বোত্তম ইলম। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«الدُّنيَا مَلعُونَةٌ ، مَلعُونٌ مَا فِيهَا ، إِلَّا ذِكرُ اللَّهِ ، وَمَا وَالَاهُ ، وَعَالِمٌ أَوَ مُتَعَلِّمٌ».

“দুনিয়া অভিশপ্ত, অভিশপ্ত তার মাঝে বিদ্যমান যাবতীয় বস্তু, তবে আল্লাহর যিকর ও তার সহযোগী বিষয় এবং আলেম ও ইলম অন্বেষণকারী ব্যতীত”।[2] কুরআনুল কারিম ঈর্ষার বস্তু, তার জন্য বয়স ও ব্যস্ততা বাঁধা হতে পারে না। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

---

[1] মুসলিম: (১১৫৯), বুখারি: ৫০৫২)

[2] তিরমিযি: (২৩২২), তিনি হাদিসটি হাসান ও গরিব বলেছেন। ইবনুল কাইয়্যূম রহ. ‘উদ্দাতুত সাবিরিণ’ গ্রন্থে হাদিসটি হাসান বলেছেন: (২৬০), আলবানি রহ. ‘সহি হাদিস সমগ্রে’ হাদিসটি হাসান বলেছেন: (২৭৯৭)

«لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ... ».

"কোনো হিংসা নেই তবে দু'জন্য ব্যক্তি ব্যতীত: এক-ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, সে দিন-রাতের বিভিন্ন অংশে তা তিলাওয়াত করে..."।[1]

ইমাম বুখারি রহ. 'ইলম ও হিকমতের ক্ষেত্রে ঈর্ষা'র অধ্যায়ে বর্ণনা করেন,

«وَقَالَ عُمَرُ: تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَبَعْدَ أَنْ تُسَوَّدُوا، وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي كِبَرِ سِنِّهِمْ».

আর ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন: "নেতৃত্ব আসার আগে ইলম তলব কর"। আবু-আব্দুল্লাহ[2] বলেন: "নেতৃত্ব পাওয়ার পরও ইলম অর্জন কর, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক সাহাবি তাদের বার্ধক্যে ইলম তলব করেছেন"।[3]

সাহাবি ও আদর্শ পুরুষগণ কেউ ছিলেন ব্যবসায়ী, কেউ ছিলেন গভর্নর, কেউ ছিলেন একাধিক স্ত্রী ও অনেক সন্তানের অধিকারী, এসব তাদেরকে কুরআনুল কারিম থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়নি। তারা প্রথম কুরআন মুখস্থ করতেন অতঃপর হাদিস।

---

[1] বুখারি: (৫০২৬)

[2] আবু আব্দুল্লাহ ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লার উপনাম।

[3] বুখারি: (পৃ.৩৯), 'বাবুল ইগতিবাত ফিল ইলমে ওয়াল হিকমাহ'

আল্লাহ তা‘আলা সবাইকে তার কুরআন মুখস্থ করার তাওফিক দান করুন।

কুরআনুল কারিম হিফয করার গুরুত্ব

মুসলিম উম্মাহর বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার কালাম হিফজ করা। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে কুরআনুল কারিম হিফজ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন, যদি কেউ নতুন ইসলাম গ্রহণ করত তাকে কুরআন শিক্ষার উপদেশ দিতেন এবং কোনো মুসলিমের নিকট সোপর্দ করতেন, যে তাকে কুরআন শিক্ষা দিবে। এ কারণে শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হওয়ার পরও কুরআন অক্ষত, অবিকৃত ও সংরক্ষিত রয়েছে। উবাদাহ ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ــ صلي الله عليه وسلم ــ يُشْغَلُ، فَإِذَا قَدِمَ رَجُلٌ مُهَاجِرٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ــ صلي الله عليه وسلم ــ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَّا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব ব্যস্ত ছিলেন, যদি কোনো ব্যক্তি হিজরত করে তার নিকট আসত, তিনি আমাদের

কারো নিকট তাকে সোপর্দ করতেন, যে তাকে কুরআন শিক্ষা দিবে"।[1]

এ কারণে সাহাবিদের বৃহৎ সংখ্যা কুরআনুল কারিমের হাফিয ছিলেন, যেমন আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী, তালহা, সাদ ও ইবনে মাসউদ প্রমুখগণ। কুরআনুল কারিম হিফয করা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ও আদর্শ। তিনি হাফিয ছিলেন, রমদানের প্রতি রাতে জিবরীল 'আলাইহিস সালামের সাথে তিনি কুরআনুল কারিম মুরাজা'আহ করতেন।[2] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ــ صلي الله عليه وسلم ــ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ».

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন"।[3] তাশাহহুদ শিক্ষার গুরুত্বকে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কুরআনুল কারিমের শিক্ষার সাথে তুলনা করেছেন, কারণ কুরআনুল কারিমের শিক্ষার গুরুত্ব সবার নিকট পরিচিত ছিল।

---

[1] আহমদ: (২২২৫৯)

[2] বুখারি: (৬)

[3] মুসলিম: (৪০৫)

আমাদের আদর্শ পুরুষগণ সর্বপ্রথম কুরআনুল কারিম হিফযের প্রতি মনোনিবেশ করতেন, কারণ কুরআন হচ্ছে জ্ঞানের উৎস ও সকল জ্ঞানের মাপকাঠি। তারা অনেকে সাবালক হওয়ার পূর্বে তারা হিফয শেষ করেছেন।

মায়মুনি রহ. বলেন: "আমি একদা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাকে জিজ্ঞাসা করি, আমার ছেলেকে আগে কি শিক্ষা দিব কুরআন না-হাদিস, আপনি কি পছন্দ করেন? তিনি বললেন, তুমি আগে কুরআন শিক্ষা দাও। আমি বললাম, পূর্ণ কুরআন শিক্ষা দিব? তিনি বললেন: যদি তার পক্ষে পূর্ণ কুরআন হিফয করা কষ্টকর হয়, তাহলে অংশ বিশেষ শিক্ষা দাও"।[1]

খতিব বাগদাদি রহ. বলেন: "তালিবে ইলম বা ইলম অন্বেষণকারীর কর্তব্য সর্বপ্রথম কুরআনুল কারিম হিফয করা, কারণ কুরআনুল কারিম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোত্তম ইলমের ভাণ্ডার"।[2]

ইমাম আবু ওমর ইবনে আব্দুল বারর রহ. বলেন: "ইলম অর্জন করার কয়েকটি ধাপ, স্তর ও বিন্যাস রয়েছে, যা লঙ্ঘন করা

---

[1] আল-আদাবুশ শারিয়াহ, লি ইবনে মুফলিহ: (২/৩৩)

[2] আল-জামে লি আখলাকির রাবি ও আদাবিস সামি: (১/১০৬)

শিক্ষার্থীর জন্য বাঞ্ছনীয় নয়... অতএব ইলম অর্জন করার প্রথম ধাপ হচ্ছে কুরআনুল কারিম হিফয করা ও তা বুঝা”।[1]

ইমাম নববি রহ. বলেন: “সর্বপ্রথম কুরআনুল কারিম হিফয করা জরুরি। আদর্শ পুরুষগণ কুরআনুল কারিম হিফয করার পূর্বে কাউকে হাদিস ও ফিকহ শিক্ষা দিতেন না। কুরআন হিফয শেষে অন্যান্য ইলম তথা হাদিস-ফিকহে এতটুকুন মগ্ন হওয়া যাবে না, যার ফলে কুরআনুল কারিমের কোনো অংশ ভুলে যাওয়ার উপক্রম হয়”।[2]

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন: “মানুষ যেসব জ্ঞানকে ইলম বলে, তার সর্বাগ্রে হচ্ছে কুরআনুল কারিম হিফয করা”।[3]

কুরআনুল কারিম হিফয করা খুব সহজ, তার সাথে মেধা অথবা বয়সের বড় সম্পর্ক নেই। অনেক মনীষী তাদের বার্ধক্য ও শেষ বয়সে কুরআনুল কারিম হিফয করেছেন, যারা আরবি জানে না তারাও হিফয করছেন। এ ক্ষেত্রে বড়দের চাইতে ছোটরা অনেক এগিয়ে।

কুরআনুল কারিম হিফয করা শরীয়তের নির্দেশ। হিফয করে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, মুসলিম যখন দৃঢ় ইচ্ছা ও প্রচণ্ড আগ্রহসহ

---

[1] জামে বায়ানুল ইলম ও ফাদলিহি: (৫২৬-৫২৮)

[2] আল-মাজমু: (১/৩৮)

[3] ফতোয়াল কুবরা: (২/২৩৫)

হিফয আরম্ভ করে, অতঃপর অলসতা-শিথিলতা বা ব্যস্ততার কারণে হিফয ত্যাগ করে, তবুও কোনো ক্ষতি নেই, যা হিফয করেছে তা বৃথা যাবে না, কোনো অংশ হিফয না করলেও হিফযের হালাকায় তিলাওয়াতের সাওয়াব থেকে কখনো মাহরূম হবে না।

ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন: "যে কুরআনুল কারিম হিফয করল, সে তার বক্ষ ও পিঠের মাঝে নবুওয়তকে ধারণ করল"। অতএব মুসলিম হিসেবে সবাইকে এ গৌরব অর্জন করার নিমিত্তে ব্রত গ্রহণ করা জরুরি। আল্লাহ সবাইকে তাওফিক দান করুন।

কুরআনুল কারিম হিফয করার ফজিলত

১. শয়তান থেকে ঘর নিরাপদ থাকে: সাধারণত হাফিয ও হিফয-শাখার ছাত্ররা সবচেয়ে বেশী কুরআন তিলাওয়াত করেন, তাই তাদের ঘর শয়তান থেকে নিরাপদ থাকে। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ». رواه مسلم

"তোমাদের ঘরগুলোকে তোমরা কবরে পরিণত করো না, নিশ্চয় সে ঘর থেকে শয়তান পলায়ন করে, যেখানে সূরা বাকারাহ পাঠ

করা হয়।”[1]

২. হাফিযগণ আল্লাহর পরিবার ভুক্ত: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ».

“নিশ্চয় মানুষদের থেকে আল্লাহর কতক পরিবার (নিজস্ব লোক) রয়েছে, তারা বলল: হে আল্লাহর রাসূল তারা কারা? তিনি বললেন: তারা আহলে কুরআন, আল্লাহর পরিবার ও তার বিশেষ ব্যক্তিবর্গ”।[2] কুরআনুল কারিমের হাফিয আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত, একজন মুসলিমের হিফয হওয়ার জন্য এ প্রেরণাই যথেষ্ট, এটা তাদের প্রতি আল্লাহর মহান অনুগ্রহ।

৩. হাফিযগণ সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারেন: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ».

“পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটি বস্তুর পূর্বে গণিমত মনে কর: তোমার যৌবনকে তোমার বার্ধক্যের পূর্বে; তোমার সুস্থতাকে তোমার

---

[1] মুসলিম: (৭৮০), তিরমিযি: (২৮৭৭), আবুদাউদ: (২০৪২), আহমদ: (৭৭৬২)

[2] ইবনে মাজাহ: (২১৫), আহমদ: (১১৮৭০), আলবানি রহ. সহি ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদিসটি সহি বলেছেন: (১৭৮)

অসুস্থতার পূর্বে; তোমার সচ্ছলতাকে তোমার অভাবের পূর্বে; তোমার অবসরতাকে তোমার ব্যস্ততার পূর্বে এবং তোমার জীবনকে তোমার মৃত্যুর পূর্বে”।[1] আহলে-কুরআন কখনো তিলাওয়াত করেন, কখনো হিফয করেন, কখনো গবেষণা করেন, কখনো তার উপর আমল করেন। এভাবে তারা প্রতি মুহূর্তের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারেন।

৪. হাফিযদের ঈমান উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়: হাফিযগণ সর্বাধিক কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করেন, তাই তারা সবচেয়ে বেশী নবী-রাসূলদের বিজয়ের কাহিনী, কাফেরদের পরাজয়ের ঘটনা, মুমিনদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও কাফেরদের প্রতি তার গোস্বার বাণী পড়েন ও শ্রবণ করেন, যার ফলে তাদের ঈমান বর্ধিত হয়। জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

«كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ، فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا».

“আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম, তখন সবেমাত্র কৈশোরে পদার্পণ করেছি। অতএব কুরআন শিখার

---

[1] হাকেম: (৪/৩০২), তিনি হাদিসটি বুখারি ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক সহি বলেছেন, কিন্তু তারা হাদিসটি তাখরিজ করেননি। বায়হাকি ফি শুআবুল ঈমান: (৭/২৬৩), আলবানি রহ. ‘সহি আল-জামে’ গ্রন্থে হাদিসটি সহি বলেছেন: (১০৭৭)

আগে আমরা ঈমান শিখেছি, অতঃপর কুরআন শিখেছি, আর তার দ্বারা আমরা আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছি”।[1]

৫. হাফিযগণ তাহাজ্জুদের স্বাদ অনুভব করে: হিফযের বদৌলতে হাফিযগণ তাহাজ্জুদের স্বাদ অনুভব করেন, হিফয না-থাকার কারণে অনেকে এ স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ».

“যে ব্যক্তি দশ আয়াত নিয়ে কিয়াম করল, তাকে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, আর যে এক-শো আয়াত নিয়ে কিয়াম করল, তাকে কানেতিন তথা ইবাদতকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, আর যে এক-হাজার আয়াত নিয়ে কিয়াম করল, তাকে মুকানতিরিণ তথা অনেক সওয়াব অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়”।[2] কুরআনুল কারিম হিফয করা ব্যতীত এ সাওয়াব অর্জন করা সম্ভব নয়।

৬. হাফিযগণ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত: সালাত ইসলামের দ্বিতীয় রোকন, তাতে ইমামতের হকদার কুরআনুল কারিমের হাফিযগণ। আবু

---

[1] ইবনে মাজাহ: (৬০), হাদিসটি সহি।

[2] আবুদাউদ: (১৩৯৮), আলবানি রহ. ‘সহি হাদিস সমগ্রে’ হাদিসটি সহি বলেছেন: (৬৪২)

মাসউদ আনসারি রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«يَؤُمُّ الْقَوْمَ، أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً».

"কওমের মধ্যে কুরআনের অধিক পাঠক (ধারক) তাদের ইমামত করবে; যদি তারা কিরাতে বরাবর হয়, তাহলে সুন্নত সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী, যদি তারা সুন্নতে বরাবর হয়, তাহলে হিজরতে অগ্রগামী ব্যক্তি ইমামত করবে"।[1]

শুধু জীবিত অবস্থায় নয়, মৃত অবস্থায় কবরেও তারা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদদের দু'জনকে এক কাপড়ে কাফন দিচ্ছিলেন, অতঃপর বলতেন:

«أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ».

"তাদের মাঝে কুরআনের অধিক ধারক কে"? যখন তাদের কাউকে চিহ্নিত করা হত, তিনি তাকে কবরে আগে রাখতেন; এবং বলতেন: "কিয়ামতের দিন আমি তাদের সাক্ষী হব"। তিনি

---

[1] মুসলিম: (৬৭৩)

তাদেরকে তাদের রক্তসহ দাফন করার নির্দেশ দেন, তাদের গোসল দেওয়া হয়নি এবং তাদের উপর সালাত আদায় করাও হয়নি"।[1] অতএব কুরআনুল কারিমের হাফিয জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

৭. হাফিযগণ জান্নাতের উঁচু মর্যাদার অধিকারী: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا».

"কুরআনের ধারককে বলা হবে, 'তুমি পড় ও চড় এবং তারতীলসহ পড়, যেভাবে তারতীলসহ দুনিয়াতে পড়তে। কারণ, তোমার মর্যাদা সর্বশেষ আয়াতের নিকট, যা তুমি পড়বে।"[2] অপর হাদিসে এসেছে:

«يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ، فَيُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً».

"কিয়ামতের দিন কুরআন আসবে ও বলবে: হে আমার রব, তাকে পরিধান করাও, তাকে সম্মানের টুপি পড়ানো হবে। অতঃপর সে

---

[1] বুখারি: (১৩৪৩)

[2] আবুদাউদ: (১৪৬৪), তিরমিযি: (২৯১৪), তিনি হাদিসটি হাসান বলেন। আহমদ: (৬৭৬০)

বলবে: হে আমার রব, তাকে বৃদ্ধি করে দাও, তাকে সম্মানের অলঙ্কার পড়ানো হবে, অতঃপর সে বলবে: হে আমার রব তার উপর সন্তুষ্ট হও, তিনি তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর তাকে বলা হবে: পড় ও উপড়ে চর এবং প্রত্যেক আয়াতের মোকাবিলায় একটি করে নেকি বর্ধিত করা হবে"।[1]

৮. হাফিযগণ ঈর্ষার পাত্র: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ».

"দু'জন্য ব্যক্তি ব্যতীত কোনো হিংসা নেই, এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, সে তা দিন-রাতের বিভিন্ন অংশে তিলাওয়াত করে। অতঃপর তার এক প্রতিবেশী শুনে বলে: যদি আমাকে অনুরূপ দেওয়া হত, যেরূপ অমুককে দেওয়া হয়েছে তাহলে আমিও তার মত আমল করতাম। আর অপর ব্যক্তি-যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, সে তা সত্য পথে খরচ করে। এক

---

[1] তিরমিযি: (২৯১৫), তিনি হাদিসটি হাসান ও সহি বলেছেন, হাদিসটি প্রকৃত পক্ষে হাসান এবং বুখারি ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক। আলবানি রহ. 'সহি আল-জামে' গ্রন্থে হাদিসটি হাসান বলেছেন: (৮০৩০)

ব্যক্তি বলল: যদি অমুককে যেরূপ দেওয়া হয়েছে আমাকেও সেরূপ দেওয়া হয়, তাহলে আমিও করব যেরূপ সে করে”।[1]

৯. হাফিযগণ দজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ: দজ্জালের আত্মপ্রকাশ কিয়ামতের সবচেয়ে বড় আলামত, দুনিয়াতে তার চেয়ে বড় কোনো ফিতনা নেই। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ».

“যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম থেকে দশটি আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দজ্জাল থেকে নিরাপদ রাখা হবে”।[2]

১০. কুরআনুল কারিমের হিফয নেককার নারীদের দেন মোহর: অনেক আদর্শ পূর্বপুরুষ কুরআনুল কারিমের কতক মুখস্থ সূরার বিনিময় নেককার নারীদের বিয়ে করেছেন। সাহাল ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, জনৈক নারী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার নফস আপনাকে হেবা করতে এসেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকালেন। অতঃপর তার দিকে তাকালেন ও অবনত করলেন, অতঃপর তিনি মাথা ঝুঁকালেন। মহিলাটি যখন দেখল, তিনি তার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন

---

[1] বুখারি: (৫০২৬)

[2] মুসলিম: (৮১২), আবুদাউদ: (৪৩২৩)

না বসে পড়ল। তার সাহাবিদের থেকে একজন উঠে বলল: হে আল্লাহর রাসূল, যদি আপনার তাকে প্রয়োজন না হয়, আমার নিকট তাকে বিয়ে দিয়ে দিন। তিনি বললেন: তোমার কিছু আছে? সে বলল: না, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন: বাড়িতে যাও, দেখ কিছু পাও কিনা? সে গেল, অতঃপর ফিরে আসল ও বলল: হে আল্লাহর রাসূল কিছু পায়নি। তিনি বললেন: দেখ, যদিও একটি লোহার আঙ্কটি পাও; সে বলল: তবে আমার এ লুঙ্গি আছে, তার জন্য তার অর্ধেক| নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

«مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ».

"সে তোমার লুঙ্গি দিয়ে কি করবে, যদি তুমি পরিধান কর তার উপর কোনো কাপড় থাকবে না, আর সে পরিধান করলে তোমার উপর কোনো কাপড় থাকবে না"? লোকটি বসে পড়ল, দীর্ঘক্ষণ বসে ছিল, অতঃপর দাঁড়ালো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন সে চলে যাচ্ছে, তাকে ডাকলেন, যখন সে আসল, তিনি বললেন:

«مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟».

“তোমার সাথে কুরআনের কতটুকু অংশ আছে? সে বলল: আমার সাথে অমুক, অমুক ও অমুক সূরা রয়েছে, সে সবগুলো গণনা করল। তিনি বললেন:

«أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟».

তুমি কি এগুলো মুখস্থ পড়তে পার? সে বলল: হ্যাঁ, তিনি বললেন:
«اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».

“যাও, তোমার সাথে কুরআনের যে অংশ আছে, তার বিনিময়ে আমি তোমাকে তার মালিক বানিয়ে দিলাম”।[1]

এভাবে উক্ত সাহাবি কুরআনুল কারিম হিফযের বিনিময়ে বিয়ে করেছেন। হিফযের বিনিময়ে কেউ যদি আপনার নিকট মেয়ে বিয়ে না দেয় ধৈর্য দরুন, হিফযকে মোহর ধার্য করে জান্নাতে অনেক হুর বিয়ে করতে পারবেন।

কুরআনুল কারিম হিফয করার পদ্ধতি

আল্লাহ তা‘আলার প্রতি অগাধ মহব্বত ও গভীর হৃদ্যতা থেকে কুরআনুল কারিম হিফয করার প্রতি উদ্যমী হোন। কুরআন হিফয করা সহজ ও তৃপ্তিদায়ক, যদি কতক পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়,

---

[1] বুখারি: (৫০৩০), মুসলিম: (১৪২৭)

তাহলে হিফয অতি সহজ, দ্রুত ও গতিশীল হয়। নিম্নে তাই কতিপয় পদ্ধতি উল্লেখ করছি:

১. হিফয করার শুরুতে নিয়ত বিশুদ্ধ করা:[1] অশুদ্ধ নিয়তের কারণে কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম কুরআনুল কারিমের জনৈক কারীকে ডেকে চেহারার উপর ভর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟، قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ».

"আর ঐ ব্যক্তি যে ইলম শিক্ষা করেছে, অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাকে জানিয়ে দেবেন তাঁর সকল নেয়ামত, ফলে সে তা জানবে। আল্লাহ বলবেন, 'এ নেয়ামতসমূহের বিনিময়ে তুমি কি করেছ?' সে বলবে, 'আমি ইলম শিখেছি, অপরকে শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি।' তিনি বলবেন, 'তুমি

---

[1] নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

"নিশ্চয় সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল, আর ব্যক্তির জন্য তাই-যা সে নিয়ত করেছে"। বুখারি: (১), মুসলিম: (১৯০৭)

মিথ্যা বলছ, তবে তুমি এ উদ্দেশ্যে ইলম শিখেছ, যেন লোকেরা তোমাকে আলেম বলে এবং এ উদ্দেশ্যে কুরআন পড়েছ, যেন লোকেরা তোমাকে কারী বলে। আর তা বলা হয়েছে।' অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ জারি করা হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে-হিঁচড়ে অবশেষে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে"।[1]

২. পার্থিব স্বার্থের জন্য কুরআনুল কারিম হিফয না করা: কুরআনের ভালো হাফিয ও সুললিত কারীদের মাঝে এ জাতীয় বিচ্যুতি বেশী পরিলক্ষিত হয়। অতএব তারা কুরআনুল কারিম দ্বারা পার্থিব সম্পদ, সম্মান, সাথীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব, মানুষের প্রশংসা কুড়ানো ও নিজের দিকে মানুষদের আকৃষ্ট করার ইচ্ছা পরিহার করুন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرۡثَ ٱلۡأٓخِرَةِ نَزِدۡ لَهُۥ فِي حَرۡثِهِۦۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرۡثَ ٱلدُّنۡيَا نُؤۡتِهِۦ مِنۡهَا وَمَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ٢٠﴾ [الشورى: ٢٠]

"যে আখিরাতের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য তার ফসলে প্রবৃদ্ধি দান করি, আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তা থেকে কিছু দেই এবং আখিরাতে তার জন্য কোনো অংশ থাকবে না"।[2] নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

---

[1] মুসলিম: (১৯০৭), তিরমিযি: (২৩৮২), নাসায়ি: (৩১৩৭), আহমাদ: (৮০৮৭)

[2] সূরা শুরা: (২০)

«مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ».

"যে ইলম অন্বেষণ করল, যেন তার দ্বারা সে আলেমদের সাথে তর্ক করতে সক্ষম হয়, অথবা তার দ্বারা মূর্খদেরকে বোকা বানাতে সক্ষম হয়, অথবা তার দ্বারা মানুষদের চেহারাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন"।[1]

৩. দোয়া, ইস্তেগফার ও সকাল-সন্ধ্যার যিকরসমূহ পড়া: গুনাহ হিফযের প্রতিবন্ধক, তাই গুনাহ থেকে তওবা করা, হিফযের জন্য দোয়া করা ও সকাল-সন্ধ্যার যিকরসমূহ রীতিমত পাঠ করা কুরআনুল কারিম হিফযের জন্য সহায়ক। সকাল-সন্ধ্যার অযিফা দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছায় শয়তান থেকে সুরক্ষা মিলে ও সময় বরকতপূর্ণ হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করার সময় বলতেন:

«أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

এ দোয়া পাঠকারী সম্পর্কে শয়তান বলে, সারা দিন সে আমার থেকে নিরাপদ হয়ে গেল।[2]

---

[1] তিরমিযি: (২৬৫৪), ইবনে মাজাহ: (২৫৩), হাদিসটি হাসান বা সহি

[2] আবুদাউদ: (৪৬৬), আলবানি রহ. মিশকাতে হাদিসটি সহি বলেছেন।

৪. একজন পরহেজগার মুয়াল্লিম নির্দিষ্ট করা ও রীতিমত হালাকায় উপস্থিত থাকা: কুরআনুল কারিম হিফয করার উদ্যোগ নেওয়ার পরবর্তী কাজ হচ্ছে একজন অভিজ্ঞ মুয়াল্লিম ঠিক করা। হিফয করার পূর্বে নির্ধারিত অংশ মুয়াল্লিমকে শুনিয়ে নিন, হিফয শেষে আবার শুনান, তাহলে আপনার হিফয নির্ভুল হবে। মুয়াল্লিম আলিম ও মুত্তাকী হলে কুরআনুল কারিমের হিফয ও তার আমল একসঙ্গে শিখা যায়। অর্থ, তাফসীর, তাকওয়া ও আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় জানা যায়, যা হিফযের জন্য সহায়ক। যদি নির্দিষ্ট কোনো হালাকার অধীন হিফয করার সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে সেখানে রীতিমত উপস্থিত থাকা ও রুটিন মোতাবেক হিফয করা।

৫. প্রতিদিন নির্ধারিত সময় হিফয করা: হিফযের ব্রত গ্রহণকারী সর্বপ্রথম পুরো দিনের কাজ ও তার সময় বণ্টন করে নিন। অতঃপর হিফযের জন্য উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করুন ও তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করুন। হিফযের পরিমাণ কম বা বেশী যাই হোক প্রতিদিন নির্ধারিত সময় হিফয করুন। হিফযের জন্য তিনটি সময় বেশ উপযোগী: ক. ফজর সালাতের পূর্বাপর; খ. আসর সালাতের পর; ও ঘ. মাগরিব সালাতের পর।

ক. ফজর সালাতের পূর্বাপর: এশার পর দ্রুত ঘুমিয়ে ফজরের পূর্বে উঠে আল্লাহর তাওফিক মোতাবেক কয়েক রাকাত তাহাজ্জুদ পড়ুন, অতঃপর জামাতের পূর্বাপর ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট হিফয

করুন। ভোর বেলার হিফয দিনের কর্মস্থলে সময়-সুযোগ মত পাঠ করুন। এ সময় হিফযকারীকে অবশ্যই এশার পর রাতের প্রথম অংশ ঘুমাতে হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

«أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার পূর্বে ঘুমানো ও তারপর কথা বলা অপছন্দ করতেন”।[1] পাবলিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ও ব্যবসায়ীরা এ সময় হিফয করতে পারেন।

খ. আসর সালাতের পর: স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রদের জন্য এ সময়টা বেশ উপযোগী। আসর সালাত যারা প্রথম ওয়াক্তে পড়েন-তাদের জন্য এ সময়টা খুব দীর্ঘ; আর যারা পরবর্তী সময়ে পড়েন-তারা এতে কম সময় পান, অতএব তারা আসর সালাতের পূর্বে ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট হিফয করুন।

গ. মাগরিব সালাতের পর: হাফেযি মাদ্রাসা কিংবা বড় মাদ্রাসার অধীন হিফয শাখার ছাত্ররা এ সময় হিফয করে। শিক্ষকতা পেশায় জড়িত ও সরকারী চাকুরীজীবীরা সাধারণত এ সময় অবসর থাকেন, তারা এতে হিফয করতে পারেন।

---

[1] বুখারি: (৫৬৮)

৬. কিভাবে হিফয করবেন: হিফয শুরু করার পূর্বে নির্ধারিত অংশের তিলাওয়াত ওয়াকফসহ শিখে নিন। এক-লাইনকে দু'ভাগ করা বা দু'শ্বাসে পড়ার প্রয়োজন হলে, কিংবা বড় আয়াত ছোট-ছোট অংশে ভাগ করার প্রয়োজন হলে ওয়াকফ্ করার স্থান জেনে নিন, যেন অর্থ ঠিক থাকে ও পড়া শ্রুতিমধুর হয়।[1] প্রথম আয়াত

---

[1] আমাদের দেশের হাফিয সাহেবগণ ওয়াকফ্ সম্পর্কে ওয়াকিফ নেই বলা যায়। এটা তাদের কুরআনুল কারিমের প্রতি অবহেলার বড় প্রমাণ। এ অবহেলা থেকে সৃষ্টি হয়েছে ওয়াকফ্ সম্পর্কে অজ্ঞতা, উদাসীনতা ও অমনোযোগীতা। তাদের ওয়াকফ্ শুনে অনেক সময় নির্বাক হতে হয়! দু'টি উদাহরণ পেশ করছি: ২০১১ই. ও ২০১২ ই. সালে উত্তরার কোনো এক কেন্দ্রীয় মসজিদে তারাবি পড়ছি। সে-দিন ছিল তৃতীয় তারাবি, হাফিয সাহেব সূরা নিসার ৪৩নং আয়াতের অংশ বিশেষ: ﴿ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءً ﴾ [النساء : ٤٣] দু'ভাগ করে পড়লেন এভাবে: ٱلنِّسَآ----ءَ فَلَمۡ তিনি নিসা শব্দের সীনের উপর মাদসহ ওয়াক্‌ফ (শ্বাস ত্যাগ) করলেন, আবার পড়া শুরু করলেন ءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ হামযাহ থেকে, যা النساء শব্দের সর্বশেষ হরফ! অর্থাৎ তিনি একটি শব্দকে এভাবে ٱلنِّسَآ---ءَ দু'ভাগ করলেন! একই কাণ্ড করলেন সূরা আরাফের ৯৫নং আয়াতের অংশ বিশেষ ﴿ وَّقَالُواْ قَدۡ مَسَّ ءَابَآ---ءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ ﴾ [الاعراف: ٩٤] এর ক্ষেত্রে। সে-দিন ছিল ষষ্ঠ তারাবি, তিনি ءَابَآءَنَا একটি শব্দকে দু'ভাগ করলেন ءَابَآ---ءَنَا এভাবে। তিনি 'বা' হরফের উপর মাদসহ ওয়াক্‌ফ করলেন, আবার পড়া শুরু করলেন 'হামযাহ' থেকে। অর্থাৎ ءَابَآءَنَا এক-শব্দকে দু'ভাগ করলেন ও দু'শ্বাসে পড়লেন! এভাবে তিলাওয়াতের কারণে অর্থ কতটা বিকৃত

হিফয শেষে পরবর্তী আয়াত হিফয করুন এবং উভয় আয়াত একসাথে মিলিয়ে পড়ার পদ্ধতি জেনে নিন। এভাবে হিফয পরিপক্ক হয়। ধীরেধীরে হিফয করুন, সম্ভব হলে নির্ধারিত অংশের অর্থ জেনে নিন, তাহলে হিফয দ্রুত ও দীর্ঘস্থায়ী হবে। নির্ধারিত সময়ে যতটুকু হিফয করা সম্ভব হয় তাই হিফয করুন ও তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করুন। অতিরিক্ত চাপ ত্যাগ করুন এবং নতুন হিফযের তুলনায় পুরাতন হিফযের প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান করুন।

হিফয করা অংশ সুন্নত, নফল ও ফরয সালাতে তিলাওয়াত করুন। শেষ রাতের সালাতে তিলাওয়াত করা অধিক উত্তম, তখন আল্লাহ স্বীয় মর্যাদা মোতাবেক দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন, আর বান্দাদের ডেকে বলেন:

«مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ».

হল সে আলোচনা ত্যাগ করলাম। হাফিয সাহেব মাদ্রাসায় পড়ুয়া একজন আলেম! তিনি রমদানি হাফিজ হিসেবে উক্ত মসজিদে তারাবি পড়ান, রমদান শেষে মুয়াজ্জিন ও হাফিজ পদে তাকে স্থায়ী নিয়োগ দান করা হয়, এভাবে কমিটি তার উপর পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এ জাতীয় ঘটনা আমাদের দেশের হাফিয সাহেবদের ক্ষেত্রে খুব সাধারণ।

“কে আমাকে আহ্বান করবে আমি তার ডাকে সারা দিব, কে আমার নিকট প্রার্থনা করবে আমি তাকে প্রদান করব, কে আমার নিকট ইস্তেগফার করবে আমি তাকে ক্ষমা করব”।[1]

হিফয করা অংশ কখনো দেখে কখনো মুখস্থ পড়ুন, সর্বদা দেখে পড়া হিফযের জন্য ক্ষতিকর, অনুরূপ সর্বদা মুখস্থ পড়া হিফয ও শুদ্ধতার জন্য বিপজ্জনক। কুরআনুল কারিমের প্রতি অধিক দৃষ্টি হিফযকে দৃঢ় করে, মনোযোগে গভীরতা আনে ও আয়াতের সাথে আন্দোলিত হতে সাহায্য করে, তাই চিন্তা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে দেখে-দেখে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করুন। আবার হিফযকে যাচাই ও নজরদারী করার জন্য মুখস্থ পড়ুন।

৭. নেককার প্রতিযোগী গ্রহণ করা: কুরআনুল কারিম হিফয করার জন্য নেককার প্রতিযোগী গ্রহণ করুন। হিফযের ক্ষেত্রে সহপাঠী কেউ থাকলে দু’জনের মাঝে সুন্দর প্রতিযোগিতা গড়ে উঠে, হিফযের সাহস ও স্পৃহা বৃদ্ধি পায় এবং সর্বদা মনে পড়ে যে, এ কল্যাণের ক্ষেত্রে আমার সাথী আমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

৮. পিছনের পড়ার প্রতি যত্ন নিন:

---

[1] বুখারি: (১১৪৫), মুসলিম: (৭৫৮)

কুরআনুল কারিম খুব দ্রুত হিফয হয়, কিন্তু রীতিমত তিলাওয়াত না করলে দ্রুত ভুলিয়ে দেওয়া হয়। ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الإِبِلِ المُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ». متفقٌ عَلَيْهِ.

“নিশ্চয় কুরআনের ধারকের উদাহরণ বাঁধা উটের উদাহরণের ন্যায়, যদি সে তাকে বেঁধে রাখে আটকে রাখবে, আর তাকে ছেড়ে দিলে সে চলে যাবে।”[1] মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, মুসা ইবনে উকবাহ অত্র হাদিস শেষে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন:

«وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ».

“কুরআনুল কারিমের ধারক যদি (কুরআন নিয়ে) কিয়াম করে, অতঃপর দিন-রাত তা তিলাওয়াত করে, তাহলে কুরআন স্মরণ রাখবে, আর যদি কুরআন নিয়ে কিয়াম না করে তা ভুলে যাবে”।[2]

পিছনের হিফয দৃঢ় করে সামনে মুখস্থ করুন। প্রতিদিন হিফযের জন্য যে সময় নির্ধারিত থাকবে, অল্প হলেও তাতে পিছনের পড়ার রুটিন রাখুন। হিফযের পরিমাণ বেশী হলে কখনো নতুন হিফয বন্ধ করে পিছনের হিফয মজবুত করুন। এতে ঢিলেমি না করা, কারণ পিছনের পড়া মুখস্থ না থাকলে হিফযের প্রতি অনীহা সৃষ্টি

[1] বুখারি: (৫০৩১), মুসলিম: (৭৮৯)

[2] মুসলিম: (৭৯০)

হয়। আবার এ ইচ্ছাও না করা যে, সবক শেষ করে পরবর্তীতে হিফয মজবুত করব, এ জাতীয় ইচ্ছা সাধারণত পূরণ হয় না।

৯. কুরআনুল কারিম শিক্ষার্থীর কতিপয় গুণগান: পোশাক, শরীর ও মুখমণ্ডল পরিষ্কার রাখা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, মুয়াল্লিম ও সহপাঠীদের সাথে বিনয়ী ও সহনশীল হওয়া, তাদের সাথে আদব রক্ষা করা। মুয়াল্লিমের সামনে উঁচু সরে কথা না বলা, যদিও তার বয়স কম হয়। অধিক হাসাহাসি ও খেলা-ধুলা ত্যাগ করা, তবে হাসি-খুশি থাকা, যেন তার প্রতি মুয়াল্লিমের মহব্বত সৃষ্টি হয়। মুয়াল্লিম থেকে কখনো কঠোর আচরণ প্রকাশ পেলে তাকে পরিহার না করা, আদব রক্ষা করা ও পড়া-শুনার প্রতি আগ্রহী থাকা। কুরআন পবিত্র বীজের ন্যায়, যা উর্বর ও পরিচ্ছন্ন জমি ব্যতীত গজায় না, তাই কুরআনুল কারিম হিফযের জন্য হিংসা ও কপটতা মুক্ত পবিত্র অন্তর থাকা চাই। হিংসা করার অর্থ আল্লাহর তকদীরে আপত্তি করা। আবার কারো হিংসার পাত্র হতে নেই, কারণ চোখেরও হক আছে। অতএব বদ-নজর থেকে সুরক্ষা ও ইখলাস ধরে রাখার স্বার্থে আপনার হিফয গোপন রাখুন। সৎ ও মহৎ চরিত্রগুণে গুণান্বিত হোন, অহংকার ও অহমিকা থেকে মুক্ত থাকুন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ».

“আল্লাহর জন্য কেউ বিনয়ী হয়নি তবে অবশ্যই আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন”।[1]

১০. নির্দিষ্ট ছাপার কুরআন পড়া: হিফযের শিক্ষার্থীদের অবশ্যই নির্দিষ্ট ছাপার কুরআন তথা হাফেযি কুরআন পড়া জরুরি। কারণ স্মৃতি শক্তির ন্যায় চোখও হিফয করে, তাই হাফেযি কুরআন পড়লে সূরা ও আয়াতের অবস্থান মনে থাকে, প্রয়োজনের সময় নির্দিষ্ট স্থান থেকে নির্দিষ্ট আয়াত খোঁজে নেওয়া সহজ হয়।

হাফেযি কুরআন পরিচিতি

আমাদের দেশে দু’ধরণের হাফেযি কুরআন রয়েছে: দেশীয় ছাপা ও সৌদি ছাপা। উভয় ছাপায় তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান: ক. পৃষ্ঠার শুরু থেকে আয়াতের শুরু এবং পৃষ্ঠার শেষে আয়াতও শেষ; খ. প্রতি পৃষ্ঠায় ১৫-টি লাইন; গ. বিশ পৃষ্ঠায় এক পারা।

প্রত্যেক হাফেযি কুরআনুল কারিমে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তবে কিছু পার্থক্যও রয়েছে, যেমন দেশী ছাপার হাফেযি কুরআনে সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত ৬১০ পৃষ্ঠা, আর সৌদি ছাপার হাফেযি কুরআনে ৬০৪ পৃষ্ঠা, মাত্র ৬-পৃষ্ঠার ব্যবধান। কারণ দেশীয় ছাপার হাফেযি কুরআনে ২৯ ও ৩০-তম পারায় যথাক্রমে

[1] মুসলিম: (২৫৯০)

২৪ ও ২৫ পৃষ্ঠা, আর সৌদি ছাপার হাফেযি কুরআনে ২৯ ও ৩০তম পারায় যথাক্রমে ২০ ও ২৩ পৃষ্ঠা। এভাবে মোট ছয় পৃষ্ঠার তফাৎ সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয় আরেকটি পার্থক্য হচ্ছে, উভয় ছাপার হাফেযি মুসহাফের সকল পৃষ্ঠায় আয়াত সংখ্যা সমান নয়, যেমন আমাদের দেশীয় ছাপার হাফেযি কুরআনে সূরা বাকারার প্রথম পৃষ্ঠায় রয়েছে ১-৪টি আয়াত, কিন্তু সৌদি ছাপার হাফেযি কুরআনে ১-৫টি আয়াত। অনুরূপ প্রত্যেক ছাপার হাফেযি কুরআনে সকল সূরার শুরু ও শেষ এক জায়গায় থেকে হয়নি, যেমন আমাদের দেশীয় ছাপায় সূরা হিজর শুরু হয়েছে ১৩নং পারা থেকে, কিন্তু সৌদি ছাপার হাফেযি কুরআনে সূরা হিজর শুরু হয়েছে ১৪নং পারা থেকে। আবার সূরা কাহাফের সর্বশেষ আয়াত দেখুন আমাদের দেশীয় ছাপার হাফেযি কুরআনের ১৬নং পারার ৪নং পৃষ্ঠার প্রথম দু'লাইনে; কিন্তু সৌদি ছাপার ১৬নং পারার ৩নং পৃষ্ঠার সর্বশেষ দু'লাইনে, তবে মৌলিক তিনটি বৈশিষ্ট্য সব হাফেযি কুরআনেই বিদ্যমান।

যার নিকট যে ছাপা সহজলভ্য, তার সেটা পড়া সমীচীন, যেন বাড়ি-সফর ও মসজিদ সর্বত্র এক ছাপার কুরআন পড়া সম্ভব হয়, তাহলে হিফয পরিপক্ক ও মজবুত হবে, সূরা-পারা ও আয়াতের অবস্থান স্মরণ থাকবে। তরজমা বা তাফসীর পড়ার ক্ষেত্রে হাফিয

সাহেবগণ হাফেযি ছাপার তরজমা-তাফসীরকে প্রাধান্য দিবেন। যাদের নিকট সৌদি ছাপার কুরআন সহজলভ্য নয়, তারা নিঃসংকোচে হিফযের জন্য দেশীয় হাফেযি কুরআন পড়ুন। কখনো দেশী ছাপা কখনো বিদেশী ছাপার কুরআন পড়া হিফযকে দুর্বল করে, যদি তাতে আয়াতের অবস্থান বিভিন্ন হয়।

কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কারণে সৌদি ছাপার হাফেযি কুরআন দ্বারা হিফয করা উত্তম। ১. সৌদি ছাপায় পৃষ্ঠা সমাপ্তির সাথে বিষয় বস্তু সমাপ্তির প্রতি যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে। উদাহরণত সূরা বাকারার পঞ্চম আয়াতের সম্পর্ক পূর্বের চারটি আয়াতের আলোচ্য বিষয় মুত্তাকীদের সাথে, ষষ্ঠ আয়াত থেকে কাফেরদের আলোচনা শুরু হয়েছে। সৌদি ছাপায় পৃষ্ঠা সমাপ্তির সাথে বিষয় বস্তু সমাপ্ত হয়েছে, নতুন পৃষ্ঠা থেকে নতুন বিষয়ের সূচনা, পক্ষান্তরে আমাদের দেশীয় ছাপায় বিনা প্রয়োজনে একটি বিষয়কে দু'পৃষ্ঠায় ভাগ করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে পৃষ্ঠা শেষে তিলাওয়াত শেষ করা, কিংবা পৃষ্ঠা শেষে রুকু করা একটি বিষয়কে বিচ্ছিন্ন করার শামিল। ২. সৌদি ছাপায় যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে যেন পৃষ্ঠা শেষে সূরা হয় এবং পৃষ্ঠা শুরুর সাথে সূরা কিংবা পারা শুরু হয়, উদাহরণত সূরা হিজর ও সূরা কাহাফকে দেখুন; পক্ষান্তরে আমাদের দেশীয় ছাপায় সূরা হিজরের দ্বিতীয় আয়াত থেকে পৃষ্ঠা ও পারা উভয় শুরু এবং সূরা কাহাফের শেষ আয়াত দ্বারা পৃষ্ঠা

শুরু, যা রীতিমত দৃষ্টিকটু ও রুচিবিরুদ্ধ। ৩. সৌদি ছাপার কুরআনে সূরা শুরুতে মাক্কী, মাদানী ও আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি, কারণ আমাদের আদর্শ পূর্বপুরুষগণ কুরআনকে গায়রে কুরআন থেকে পৃথক করার উপর ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন।[1] দ্বিতীয়ত কতিপয় সূরার ব্যাপারে মাক্কী বা মাদানী অকাট্য সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হয়নি, পক্ষান্তরে আমাদের দেশীয় কুরআনে মাক্কী-মাদানীসহ আয়াত সংখ্যাও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যা আদর্শ মনীষীদের নীতি বিরুদ্ধ সন্দেহ নেই। ৪. সৌদি ছাপার কুরআন আরবি ভাষার সঠিক নীতিমালা অনুসরণ করে লিখা, আমাদের দেশীয় ছাপার ক্ষেত্রে যার অনুসরণ করা হয়নি, যেমন আলিফের পর একটি উহ্য আলিফকে বুঝানোর জন্য আমাদের দেশীয় ছাপায় লিখা হয় آمنوا। অথচ বিশুদ্ধ পদ্ধতি হচ্ছে ءامنوا। লিখা।[2]

---

[1] ইবনে ওমর, ইবনে মাসউদ, ইবরাহিম নাখয়ি ও ইবনে সিরিন প্রমুখ মহা মনীষীগণ কুরআনুল কারিমকে গায়রে কুরআন থেকে পৃথক করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

[2] এ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, আরবরা আল্লাহর কালাম হিফজ করা, তিলাওয়াত করা ও লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অনেক অগ্রগামী। অতএব এ কথা বলা একেবারে অসার যে, "কুরআন নাযিল হয়েছে সৌদি আরবে, তিলাওয়াত করেছে মিসর এবং বুঝেছে হিন্দুস্তান"। কওমী ধারার মাদ্রাসাসমূহে এ কথাটি প্রবাদ হিসেবে বেশ প্রসিদ্ধ, তবে কারো না শোনা অসম্ভব নয়, আমরা অনেকে শুনেছি ও তৃপ্তিসহ উচ্চারণ করেছি।

আমাদের দেশের হাফেয সাহেবগণ পৃষ্ঠা হিসেবে মুখস্থ করেন, তাই তারা আয়াত শুনে পারা-পৃষ্ঠা দক্ষতার সাথে বলতে পারেন, কিন্তু আয়াত ও রুকু নাম্বার কদাচিৎ ছাড়া বলতে পারেন না। তাদের এ অভ্যাসের প্রভাব সালাতেও পড়ে, বিশেষ করে তারাবির সালাতে। তাতে তারা পৃষ্ঠা হিসাবে তিলাওয়াত করেন, বিধায় অনেক সময় অর্থ ও বিষয় বস্তু ঠিক থাকে না। তাই তাদের তিলাওয়াত শুনে অর্থ-জানা মুসল্লিরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না, ভারত-পাকিস্তানের হাফেযগণ পড়েন রুকু হিসেবে। তারা আয়াত শুনে সূরা ও রুকুর নাম্বার দক্ষতার সাথে বলতে পারেন। আরববিশ্ব, বিশেষ করে সৌদি আরবের হাফেযগণ অর্থ জানেন এবং নির্দিষ্ট ছাপার কুরআন পড়েন বিধায় পৃষ্ঠার নাম্বার ঠিকঠিক বলতে পারেন এবং আয়াতের বিষয়-বস্তুও ঠিক রাখতে সক্ষম হন।

কুরআনুল কারিম শিক্ষাদানকারীর আদব

আল্লাহ তা'আলা যেরূপ কুরআন নাযিল করেছেন, অনুরূপ তা শিক্ষা দেওয়ার কতিপয় আদব নাযিল করেছেন, যা প্রত্যেক মুয়াল্লিমের জানা জরুরি। কারণ, আদব হচ্ছে শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যকার বন্ধন ও যোগসূত্র। আদব যেরূপ গভীর ও অকপট হয়, তাদের মধ্যকার সম্পর্ক সেরূপ দৃঢ় ও মজবুত হয়। আদব সুন্দর

হলে শিক্ষার আদান-প্রদান সুন্দর, ব্যাপক ও বরকতময় হয়। তাই নিম্নে মুয়াল্লিমের কতিপয় আদব উল্লেখ করছি:

১. কুরআনুল কারিমকে আদর্শ বানানো: কুরআনুল কারিমের শিক্ষক সর্বপ্রথম নিজেকে কুরআনুল কারিমের আখলাক দ্বারা সজ্জিত করবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَتۡلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ ١٢١ ﴾ [البقرة: ١٢١]

“আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তা পাঠ করে যথার্থভাবে”।[1]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তারা যথাযথভাবে কুরআনুল কারিম অনুসরণ করে”।[2] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়ে ছিল, তিনি বলেন:

«كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ».

“তার আখলাক ছিল কুরআন”।[3] অতএব নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায় কুরআনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা তার উত্তরসূরির প্রথম কাজ।

---

[1] সূরা বাকারা: (১২১)

[2] ইবনে কাসির: (১/৪০৩)

[3] আহমদ: (২৪৭৭৩)

২. উপযুক্ত জায়গায় তালিম দেওয়া: কুরআনুল কারিম শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করা জরুরি। শিক্ষার্থীর সাথে সম্পৃক্ত বা তার মালিকানাধীন জায়গায় তালিম না দেওয়া, শাসক কিংবা ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে পাঠদান থেকে বিরত থাকা শ্রেয়। আমাদের আদর্শ পূর্বপুরুষগণ শিক্ষার্থীর সাথে সম্পৃক্ত জায়গায় বসে দীনি শিক্ষা প্রদান করেননি। এটা অহংকার নয়, বরং ইলমের মর্যাদার সুরক্ষা। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ».

"নিজেকে অসম্মান করা কোনো মুমিনের পক্ষে সমীচীন নয়"।[1]

অপর হাদিসে তিনি বলেন:

«خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ».

"তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি যে-কুরআন শিখে ও তা শিখায়"।[2]

৩. শিক্ষার্থীর প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগ প্রদান করা: শিক্ষার্থীর প্রতি মুয়াল্লিমের পূর্ণ মনোনিবেশ করা, তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা, কেউ অনুপস্থিত থাকলে তার খবরাখবর নেওয়া শিক্ষকের বিশেষ

---

[1] তিরমিযি: (২২৫৪), ইবনে মাজাহ: (৪০১৬), আহমদ: (২২৯৩৩)

[2] বুখারি: (৫০২৭), তিরমিযি: (২৯০৭) আহমদ: (১/২৫৭), আবুদাউদ: (১/৩৩৫)

গুণ। পাঠদানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কথা বা কাজে মগ্ন না হওয়া, পরিপূর্ণ মনোযোগসহ সবার তিলাওয়াত শ্রবণ করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ٢٠٤﴾ [الاعراف: ٢٠٣]

“যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তোমরা মনোযোগসহ শ্রবণ কর ও তার জন্য চুপ থাক, তাহলে তোমাদের উপর রহম করা হবে”।[1]

৪ .শিক্ষার্থীদের মাঝে ইনসাফ ও সমতা বজায় রাখা: ছোট-বড়, ধনী-গরীব সবার ক্ষেত্রে ইনসাফ বজায় রাখা, প্রত্যেককে তাদের অধিকার পাইয়ে দেওয়া। কুরআন শিক্ষাদানকারীর পক্ষে সমীচীন নয় ধনীকে কাছে নেওয়া, গরীবকে দূরে ঠেলে দেওয়া, ধনীর জন্য বিনয়ী হওয়া ও গরীবের জন্য কঠোর হওয়া। উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কাউকে কারো উপর প্রাধান্য না দেওয়া। কাউকে সম্বোধন করে কাউকে পরিত্যাগ না করা, সবার প্রতি সমান দৃষ্টি ও সমান মনোযোগ প্রদান করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ ١٣٥﴾ [النساء : ١٣٥]

“হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে”।[2]

---

[1] সূরা আরাফ: (২০৪)

[2] সূরা নিসা: (১৩৫)

৫. ধৈর্যধারণ করা: কারো থেকে ভুল বা অসংলগ্নতা প্রকাশ পেলে ধৈর্যধারণ করা, তিরস্কার ও অসম্মান না করা। শিক্ষার্থীদের ঘনিষ্ঠ হওয়া, তারা যেন মুয়াল্লিমকে পেয়ে খুশি হয়। বেশী রূঢ় বা বেশী শিথিল না হওয়া, বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ». وفي رواية لمسلم: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ».

"নিশ্চয় আল্লাহ সহনশীল, সহনশীলতা পছন্দ করেন এবং তিনি সহনশীলতার বিনিময়ে যা প্রদান করেন, তা কখনো কঠোরতার বিনিময়ে প্রদান করেন না"।[1] মুসলিমের এক বর্ণনা রয়েছে: "কোনো বস্তুতে নম্রতা অবস্থান করে না, তবে অবশ্যই নম্রতা ঐ বস্তুকে সুন্দর করে এবং কোনো বস্তু হতে নম্রতা অপসারণ করা হয় না, তবে অবশ্যই নম্রতার অনুপস্থিতি ঐ বস্তুকে বিনষ্ট করে"।[2] আইয়ুব সাখতিয়ানী রহ. বলেন: "আলেমের উচিত আল্লাহর প্রতি বিনয় ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিজের মাথার উপর মাটি রাখা"।

---

[1] মুসলিম: (২৫৯৬)

[2] মুসলিম: (২৫৯৭)

৬. শিক্ষার্থীদের কল্যাণ কামনা করা: কুরআন পড়তে আসা শিক্ষার্থীকে স্বাগত জানানো ও তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা বিশেষ এক আদব। আবু হারুন আবাদি রহ. বলেন, আমরা আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট আসতাম, তিনি বলতেন, তোমাদেরকে স্বাগতম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের জন্য কল্যাণ কামনার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন:

«إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرَضِينَ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا».

"নিশ্চয় মানুষেরা তোমাদের অনুসারী, আর নিশ্চয় দীন শিখার জন্য মানুষেরা দুনিয়ার দিগন্ত থেকে তোমাদের নিকট আসবে, যখন তারা তোমাদের নিকট আসবে তোমরা তাদের কল্যাণ কামনা কর"। [1] অপর হাদিসে তিনি বলেন:

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ».

"নিশ্চয় দীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা করা, আমরা বললাম: কার জন্য? তিনি বললেন: আল্লাহর জন্য, তার কিতাবের জন্য, তার রাসূলের জন্য ও মুসলিমদের ইমামদের জন্য ও তাদের সর্বসাধারণের জন্য"।[2] অতএব কুরআনুল কারিমের শিক্ষার্থীদের

---

[1] তিরমিযি: (২৬৫০), ইবনে মাজাহ: (২৪৯) প্রমুখগণ।

[2] মুসলিম: (৫৬)

সাথে কল্যাণ কামনা করা কুরআনুল কারিমের সাথে কল্যাণ কামনা করার অংশ।

আহলে-ইলমগণ বলেন, কোনো শিক্ষার্থীর নিয়ত অশুদ্ধ প্রমাণিত হলে তাকে ইলমে-দীন শিখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না করা তার প্রতি অনুগ্রহ করার শামিল। সুফইয়ান রহ. বলেন: "ইলম শিক্ষার পিছনে সবার নিয়ত থাকে, আমরা গায়রুল্লার জন্য ইলম শিখে ছিলাম, কিন্তু ইলম গায়রুল্লাহর জন্য হতে অস্বীকার করেছে"।

৭. শিক্ষার্থীদের উপদেশ দেওয়া: শিক্ষার্থীদের কুরআনুল কারিমের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা, সময়-সুযোগ বুঝে হাফিযদের মর্যাদার কথা আলোচনা করা, হিফয করার উপকারিতা, তিলাওয়াত করার আদব আলোচনা করা এবং দুনিয়া সংগ্রহ ও তাতে মগ্ন হওয়া থেকে সতর্ক করা আদর্শ শিক্ষকের এক বিশেষ গুণ।

৮. আল্লাহর উপর তাওয়াককুল করা: কুরআনুল কারিমের মুয়াল্লিমের পক্ষে সমীচীন নয় স্বীয় প্রয়োজন মানুষের নিকট পেশ করা। তিনি সকল প্রয়োজন আল্লাহর নিকট পেশ করবেন এবং সম্পদশালী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকবেন। চেষ্টা করবেন যেন মানুষের প্রয়োজন তার মাঝে সৃষ্টি হয়, মানুষ যেন দীনের জন্য তার মুখাপেক্ষী হয়। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تعالى لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

"যে এমন ইলম শিখল, যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়, অথচ সে তা শিখেছে একমাত্র দুনিয়ার সম্পদ অর্জন করার জন্য, কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না"।[1]

অতএব কুরআনুল কারিমের মুয়াল্লিমগণ স্বীয় প্রতিদান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, যেমন নবী-রাসূলগণ করতেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٠٩ ﴾ [الشعراء : ١٠٩]

"আর আমি তার (দীন শিখানোর) উপর তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না, আমার পারিশ্রমিক শুধু সৃষ্টিকুলের রবের নিকট"।[2]

৯. কুরআনুল কারিমের মুয়াল্লিমের আরো কতিপয় গুণ: দানশীল ও উদার হওয়া, আল্লাহ তাকে প্রদান করলে মানুষকে প্রদান করা, তার উপর সংকীর্ণ করা হলে বিরত থাকা। দুনিয়ার মোহ ও তার

---

[1] আহমদ: (২/৩৩৮), আবু দাউদ: (২/২৮৯), ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থকারগণ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। মিশকাত গ্রন্থে: (২২৭) আলবানি রহ. এ হাদিসটি সহি বলেছেন।

[2] সূরা শু'আরা: (১০৯)

সামগ্রীর সাথে সম্পৃক্ত না হওয়া। পিতা-মাতার খিদমত করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা। সাথীদের কল্যাণ কামনা করা, দৃঢ়তা, একাগ্রতা ও গাম্ভীর্যতাকে প্রাধান্য দেওয়া, অধিক হাসি-ঠাট্টা থেকে বিরত থাকা।

কথা বলার প্রয়োজন হলে বলা, অন্যথায় চুপ থাকা। অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে ঘাটাঘাটি না করা। জিহ্বার অনিষ্ট থেকে নাজাতের জন্য শত্রুর মত তাকে ভয় করা, শত্রুকে বন্ধী রাখার মত তাকে বন্ধী রাখা।

নিজের প্রশংসা না করা, নফস থেকে সতর্ক থাকা, গীবত পরিহার করা, কাউকে খাটো না করা, কারো মুসিবত দেখে খুশি না হওয়া, কারো উপর সীমালঙ্ঘন না করা, কারো সাথে হিংসা না করা, প্রমাণ ব্যতীত কারো সম্পর্কে খারাপ ধারণা না করা। নিষিদ্ধ বস্তু হতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিফাজত করা। মুখ ও হাত দ্বারা কাউকে কষ্ট না দেওয়া, কারো উপর জুলম না করা, জুলমের শিকার হলে সম্মানজনকভাবে প্রতিকারের ব্যবস্থা করা, অন্যথায় ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহকে সন্তুষ্ট ও শত্রুকে রাগান্বিত করার জন্য গোস্বাকে হজম করা। সত্য যার পক্ষ থেকে প্রকাশ হোক গ্রহণ করতে বিলম্ব না করা।

অর্থ উপার্জন করার নিম্নমানের পেশা ও পদ্ধতি পরিহার করা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা, শরীর দূর গন্ধ মুক্ত রাখা, দাঁড়ি ছেড়ে দেওয়া ও মোচ ছোট করা।

১০. শিক্ষার্থীদের মহব্বত করা: শিক্ষার্থীদের মহব্বত করা ও তাদের রুচি-সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা, স্বীয় নফস ও নিজ সন্তানের ন্যায় তাদের প্রতি গুরুত্বারোপ করা, নিজ সন্তানের দুর্ব্যবহার ও অসদাচরণ সহ্য করার ন্যায় তাদের অসদাচরণ সহ্য করা আদর্শ শিক্ষকের বিশেষ গুণ। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন:

«أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي لو استطعت أن لا يقع الذباب على وجهه لفعلت ، وفي رواية إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني».

"আমার নিকট আমার সে ছাত্র বেশী প্রিয়, যে মানুষদের ডিঙ্গিয়ে আমার নিকট বসে, যদি আমার পক্ষে সম্ভব হত তার চেহারায় কোনো মাছি বসবে না, আমি তাই করতাম"। অপর বর্ণনায় রয়েছে: "তার উপর মাছি বসে, তাও আমাকে কষ্ট দেয়"।

কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করার নিয়ত

কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করার জন্য কোনো নিয়তের প্রয়োজন নেই, তবে নির্দিষ্ট নিয়ত থাকা ভালো। কারণ নিয়তসহ কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা তাতে চিন্তা করা ও তার দ্বারা

অনুপ্রাণিত হওয়ার শামিল, যার প্রতি শরীয়তের নির্দেশ রয়েছে। মালিক আশজায়ি রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন:

«قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً " فَقَامَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ لَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ».

"আমি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একরাত কিয়াম করেছি, তিনি দাঁড়ালেন ও সূরা বাকারা পড়লেন। তিনি রহমতের কোনো আয়াত অতিক্রম করতেন না, তবে অবশ্যই বিরতি নিতেন ও প্রার্থনা করতেন। এবং শাস্তির কোনো আয়াত অতিক্রম করতেন না, তবে অবশ্যই বিরতি নিতেন ও আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।"[1]

এ হাদিস বলে, তিলাওয়াতের সময় কুরআনুল কারিমের অর্থ ও বিষয়-বস্তুতে চিন্তা করা, তার রঙে রঙিন হওয়া, দোয়ার জায়গায় দোয়া করা ও শাস্তির জায়গায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত, তার উপর আমল করার জন্য অবশ্যই নিয়তসহ তিলাওয়াত করা জরুরি। বিশেষ কোনো নিয়তসহ যখন তিলাওয়াত করা হয়, তখন প্রতি আয়াত পড়ার সময় তার দিকে হৃদয় ধাবিত হয় এবং তাতে কিছু সময় চিন্তা

[1] আবু দাউদ: (৮৭৩)

করার জন্য হৃদয় প্রস্তুত থাকে। তাই নিম্নে তিলাওয়াত করার কতিপয় নিয়ত উল্লেখ করছি:

১. হিদায়েত ও ইলম হাসিল করার নিয়তে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ ١٨٥﴾ [البقرة: ١٨٥]

“রমদান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়েত স্বরূপ এবং হিদায়েতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী স্বরূপ ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে”।[1]

২. আমল করার নিয়তে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ ٣﴾ [الاعراف: ٣]

“তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না”।[2]

---

[1] সূরা বাকারা: (১৮৫)

[2] সূরা আরাফ: (৩)

৩. ঈমান বৃদ্ধির নিয়তে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِذَا مَآ أُنزِلَتۡ سُورَةٞ فَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمۡ زَادَتۡهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنٗاۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا ١٢٤﴾ [التوبة:١٢٤]

"আর যখনই কোন সূরা নাযিল করা হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, 'এটি তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি করল? অতএব যারা মুমিন, নিশ্চয় তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে"।[1]

৪. আল্লাহ তা'আলাকে শুনানোর নিয়তে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা। সহি হাদিসে এসেছে:

«مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ، مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ ».

"আল্লাহ কোনো বস্তু এভাবে শ্রবণ করেননি, যেভাবে কুরআনের ক্ষেত্রে সুন্দর আওয়াজ সম্পন্ন নবীর জন্য শ্রবণ করেছেন, যিনি উচ্চ স্বরে কুরআন মাজিদ পড়েন।"[2]

৫. শরীর ও আত্মার রোগ থেকে মুক্তি এবং ঝাড়-ফুঁক করার নিয়তে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

---

[1] সূরা তাওবা: (১২৪)

[2] সহি বুখারি: (৭৫৪৪), (৫০২৩), (৫০২৪), (৭৪৮২), (৭৫২৭), মুসলিম: (৭৯৪)

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧ ﴾ [يونس : ٥٧]

“হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তরসমূহে যা থাকে তার শিফা, আর মুমিনদের জন্য হিদায়েত ও রহমত”।[1]

৬. কিয়ামতের দিন উঁচু মর্যাদা লাভ করার নিয়তে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿إِنَّهُمۡ كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رَغَبٗا وَرَهَبٗاۖ وَكَانُواْ لَنَا خَٰشِعِينَ ٩٠ ﴾ [الانبياء: ٩٠]

“নিশ্চয় তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত, আর আমাকে আশা ও ভীতিসহ ডাকত, আর তারা ছিল আমার নিকট বিনয়ী”।[2]

৭. সাওয়াব লাভ করার নিয়তে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ، أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ، فِي غَيْرِ إِثْمٍ، وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُحِبُّ ذَلِكَ، قَالَ: " أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ، أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ G خَيْرٌ

[1] সূরা ইউনুস: (৫৭)

[2] সূরা আম্বিয়া: (৯০)

لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ؟ ».

“তোমাদের থেকে কে পছন্দ করে প্রতিদিন বুতহান অথবা আকিক স্থানে যাবে, অতঃপর সেখান থেকে উঁচু কুজ বিশিষ্ট দু’টি উট নিয়ে আসবে, অপরাধ সংগঠন ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত? আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তা পছন্দ করি। তিনি বললেন: তাহলে কেন তোমাদের কেউ মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাব থেকে দু’টি আয়াত শিখে না, অথবা তিলাওয়াত করে না, যা তার জন্য দু’টি উট থেকে উত্তম, তিনটি আয়াত তিনটি উট থেকে উত্তম, চারটি আয়াত চারটি উট থেকে উত্তম, অনুরূপ আয়াতের সংখ্যা উটের সংখ্যা থেকে উত্তম”।[1]

৮. কিয়ামতের দিন কুরআনুল কারিমের সুপারিশ লাভ করার নিয়তে তিলাওয়াত করা। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ

[1] মুসলিম: (৮০৬), আবু দাউদ: (১৪৫৬)

كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ»

“তোমরা কুরআন পড়, কারণ কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হবে। তোমরা দু’টি উজ্জ্বল বস্তু শিখ: সূরা বাকারা ও সূরা আলে-ইমরান, কারণ কিয়ামতের দিন সূরা দু’টি আসবে, যেন তারা দু’টি মেঘ, অথবা যেন তারা দু’টি ছায়া, অথবা যেন তারা সারিবদ্ধ পাখিদের দু’টি ডানা, তারা উভয়ে তাদের পাঠকের জন্য সুপারিশ করবে, তোমরা সূরা বাকারা পড়, কারণ তা শিক্ষা করা বরকত ও ত্যাগ করা অনুশোচনা, কোনো যাদুকর তা শিখতে সক্ষম নয়”।[1]

৯. আল্লাহর রহমত লাভ করার নিয়তে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿هَٰذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمۡ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ٢٠٣﴾ [الاعراف: ٢٠٢]

“এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ। আর তা হিদায়েত ও রহমত সে কওমের জন্য যারা ঈমান আনে”।[2]

১০. কুরআনুল কারিম শ্রবণ করার সময় আল্লাহর রহমত লাভ করার নিয়ত করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

---

[1] আহমদ: (৮৮২৩)

[2] সূরা আরাফ: (২০৩)

﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٢٠٤﴾ [الاعراف: ٢٠٣]

"আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমরা রহমত লাভ কর"।[1]

হে আল্লাহ আপনি আমাদের উপর রহম করুন, যেন আপনার রহমতের পর কারো রহমতের প্রয়োজন না হয়, আপনি বলেছেন:

﴿ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ١٥٧ ﴾ [ال عمران: ١٥٧]

"নিশ্চয় আল্লাহর মাগফেরাত ও রহমত অধিকতর উত্তম, তোমরা যা জমা কর তার চেয়ে"।[2]

'সাদাকাল্লাহুল আজিম' বলার বিধান

কতিপয় কারি কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত শেষে صَدَقَ الله الْعَظِيْمُ বলেন।[3] এরূপ বলার কোনো ভিত্তি নেই। এতে সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা সত্যবাদী, তার কালাম চিরসত্য। ইমাম নাসাঈ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন:

((إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ)).

---

[1] সূরা আরাফ: (২০৪)

[2] সূরা আলে-ইমরান: (১৫৭)

[3] 'সাদাকাল্লাহুল আযিম' অর্থ 'মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন'।

“নিশ্চয় সবচেয়ে সত্যকথা হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার কিতাব এবং সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদের আদর্শ”।[1] তিলাওয়াতের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত কথার কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। ড. বকর আবু জায়েদ রহ. বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ قُلۡ صَدَقَ ٱللَّهُۗ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۖ ٩٥ ﴾ [ال عمران: ٩٥] وقال تعالى: ﴿ وَمَنۡ أَصۡدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثٗا ٨٧ ﴾ [النساء : ٨٧] وقال تعالى: ﴿ وَمَنۡ أَصۡدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلٗا ١٢٢ ﴾ [النساء : ١٢٢]

“বল, আল্লাহ সত্য বলেছেন, সুতরাং তোমরা ইবরাহীমের মিল্লাতের অনুসরণ কর একনিষ্ঠভাবে”।[2] অপর আয়াতে তিনি বলেন: “আর কথায় আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে?”[3] অপর আয়াতে তিনি বলেন: “আর কথায় আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে?”[4]

এসব আয়াতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় কিতাব তাওরাত ও অন্যান্য গ্রন্থে যা বলেছেন সত্য বলেছেন, অনুরূপ কুরআনুল কারিমে তিনি যা বলেছেন তাও সত্য বলেছেন; তবে এ থেকে

---

[1] নাসায়ি আস–সুগরা: (১৫৭৮)

[2] সূরা আলে-ইমরান: (৯৫)

[3] সূরা নিসা: (৮৭)

[4] সূরা নিসা: (১২২)

কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত শেষে ‘সাদাকাল্লাহুল আজিম’ বলার বৈধতা প্রমাণিত হয় না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা তার কোনো সাহাবি কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত শেষে কখনো ‘সাদাকাল্লাহুল আজিম’ বলেননি, অথচ তারা এ আয়াতসমূহ আমাদের চেয়ে বেশী পড়তেন এবং বেশী বুঝতেন। যদি তার দাবি কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত শেষে ‘সাদাকাল্লাহুল আজিম’ বলা হত, তারা তার উপর আমল করতেন এবং আমরা তাদের অনুসরণ করতাম, তাদের অনুসরণ করাই আমাদের জন্য কল্যাণকর।

সমকালীন কতক ভাই বলেন, ইমাম বায়হাকির গ্রন্থ ‘আল-জামে লি-শুআবিল ঈমান’[1]-এ তার পক্ষে দলিল রয়েছে, এটা তাদের ভুল। আমাদের জানা মতে গ্রহণযোগ্য কোনো আলেম ‘সাদাকাল্লাহুল আজিম’ বলা বৈধ বলেননি, না-প্রসিদ্ধ কোনো ইমাম; বস্তুত এটা মানুষের বানানো প্রথা ও নতুন আবিষ্কৃত, শরিয়তের পরিভাষায় তার নাম বিদআত। আল্লাহ ভালো জানেন”।[2]

কোনো উপলক্ষকে কেন্দ্র করে কেউ যদি صَدَقَ اللهُ বলে, তাহলে সমস্যা নেই; কারণ এরূপ বলা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। বুরাইদাহ

[1] আরবি নাম নিম্নরূপ: الجامع لشعب الإيمان للبيهقي

[2] দেখুন: ‘বিদাউল কুররা’ গ্রন্থ।

রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে খুতবা দিচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় হাসান ও হুসাইন চলে আসল। তাদের গায়ে ছিল দু'টি লাল জামা, তারা হোঁচট খেতে ছিল ও চলতে ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার থেকে নেমে তাদের তুললেন ও সামনে বসালেন। অতঃপর তিনি বললেন:

صدق الله: ﴿ إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ ١٥ ﴾ [التغابن : ١٥]

"আল্লাহ সত্য বলেছেন: 'নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও সন্তান ফিতনা"।[1] তাদেরকে দেখলাম হাঁটছে ও হোঁচট খাচ্ছে, আমি সহ্য করতে পারলাম না, কথা বন্ধ করে তাদেরকে উঠিয়ে নিলাম"।[2]

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও', তিনি বলেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনাকে কুরআন পড়ে শোনাব, অথচ আপনার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে! তিনি বললেন: 'আমি

---

[1] সূরা তাগাবুন: (১৫)

[2] তিরমিযি: (৩৭৭৪), হাকিম: (১/২৮৭), হাকিম বলেন: হাদিসটি মুসলিমের শর্ত মোতাবেক সহি, ইমাম যাহাবি রহ. তার সমর্থন করেছেন, তবে বুখারি-মুসলিম তারা কেউ হাদিসটি বর্ণনা করেননি, আলবানি রহ. হাদিসটি সহি বলেছেন।

অপর থেকে কুরআন শুনা পছন্দ করি'। অতঃপর আমি তাকে সূরা নিসা পাঠ করে শুনাই, যখন নিম্নোক্ত আয়াতে পৌঁছি:

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا ۝٤١ ﴾ [النساء : ٤١]

'অতএব কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে উপস্থিত করব তাদের উপর স্বাক্ষীরূপে?'[1] তিনি বললেন, 'হাসবুক'[2]। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখি, তার দু'চোখ অশ্রু ঝরাচ্ছে"।[3]

শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "আমাদের জানা-মতে কোনো আহলে ইলম ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেননি যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের «حسبك». বলার পর তিনি صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ বলে কুরআন তিলাওয়াত শেষ করেছেন"।[4]

শায়খ উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'সাদাকাল্লাহু বলে কুরআন তিলাওয়াত শেষ করা বিদআত, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

---

[1] সূরা নিসা: (৪১)

[2] তুমি এখানে পড়া ক্ষান্ত কর, এখানে পড়া শেষ কর।

[3] বুখারি: (৫০৪৯), মুসলিম: (৮০২)

[4] মাজমু ফতোয়া ও মাকালাত: (খ.৭)

ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের থেকে প্রমাণিত নেই যে, তারা 'সাদাকাল্লাহুল আজিম' বলে তিলাওয়াত শেষ করেছেন"।[1]

সাদাকাল্লাহু বলার প্রচলন:

'কাতারে'র ওয়াকফ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত 'ইসলাম ওয়েব'[2] সাইটের (১৩৯৪৫২)-নং ফতোয়ায় 'সাদাকাল্লাহু' বলা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে: "কবে ও কিভাবে সাদাকাল্লাহুল আজিম বলার প্রচলন ঘটেছে জানা যায়নি। পূর্ববর্তী কতক নেককার লোক 'সাদাকাল্লাহুল আজিম' উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার পশ্চাতে তারা কোনো দলিল পেশ করেননি; যেমন হাফিয ইবনুল জাযারি 'আন-নাশর' কিতাবে বলেন: আমার কতক শায়খকে দেখেছি, তারা কুরআন খতম করে বলতেন:

«صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، وهذا تنزيل من رب العالمين، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين».

ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ তার তাফসিরে বলেন, হাকিম আবু আব্দুল্লাহ তিরমিযি 'নাওয়াদিরুল উসুল' কিতাবে বলেন: কুরআনুল কারিমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার একটি পদ্ধতি হচ্ছে তিলাওয়াত শেষে আল্লাহকে সত্যারোপ করা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

[1] ফতোয়া নুরুন 'আলাদ-দারব: (খ.৫, পৃ.২), সংক্ষিপ্ত।

[2] islamweb.net

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীন প্রচার করেছেন তার সাক্ষী প্রদান করা, যেমন বলা:

«صدقت رب وبلغت رسلك، ونحن على ذلك من الشاهدين، اللَّهُمَّ اجعلنا من شهداء الحق، القائمين بالقسط، ثم يدعو بدعوات».

এ থেকে আমাদের ধারণা চতুর্থ হিজরিতে ‘সাদাকাল্লাহু’ বলার প্রচলন ঘটেছে, কারণ হাকিম তিরমিযি চতুর্থ শতাব্দীর আলেম ছিলেন, তবে তার পূর্বেও তার প্রচলন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহ ভালো জানেন”।

সৌদি আরবের উলামা পরিষদের ফতোয়া[1]

কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত শেষে সাদাকাল্লাহুল আজিম বলা বিদআত, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদা ও কোনো সাহাবী থেকে এরূপ বলা প্রমাণিত নেই, পরবর্তী কোনো ইমাম থেকেও নয়। অথচ কুরআনুল কারিমের প্রতি তাদের গুরুত্ব বেশী ছিল, তারা বেশী তিলাওয়াত করতেন এবং কুরআন সম্পর্কে তারা বেশী জানতেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ».

---

[1] লাজনায়ে দায়েমা: (খ.৪, পৃ.১১৮)

“যে আমাদের দীনে নতুন কিছু সৃষ্টি করল, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা পরিত্যক্ত”।[1] ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ».

“যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যার উপর আমাদের দীন নেই, তা পরিত্যক্ত”।[2]

হাফিযদের প্রতি উপদেশ[3]

আল্লাহ আ'তালার জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি নিজ দয়া ও কৃপায় নেককার নারী-পুরুষ সবার জন্য কুরআনুল কারিম মুখস্থ করা সহজ করে দিয়েছেন। দুনিয়া জুড়ে কুরআনুল কারিমের হাফিযের সংখ্যা কত অনুমান করা মুশকিল। কত পুরুষ, কত নারী হিফয করেছেন তার সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আল্লাহ তা'আলা সত্যি বলেছেন:

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۝١٧ ﴾ [القمر: ١٧]

---

[1] বুখারি: (২৬৯৭)

[2] মুসলিম: (১৭২১)

[3] শায়খ মুহাম্মদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ কুরআনুল কারিমের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশ প্রদান করেন, এ শিরোনামের অধীন আমরা তার অনুবাদ পেশ করছি।

হে হাফিযে কুরআন, আপনাকে শুভসংবাদ, আল্লাহ স্বীয় কিতাব দুনিয়ার বুকে হিফাজত করার জন্য আপনাকে বাছাই করেছেন। আপনি সে ভাগ্যবানদের একজন যাদেরকে আল্লাহ স্বীয় ওয়াদা সংরক্ষণ করার জন্য মনোনীত করেছেন। তিনি বলেন:

﴿ إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ۝٩ ﴾ [الحجر: ٩]

হে হাফিযে কুরআন, আপনি যা অর্জন করেছেন তা কখনো ছোট জ্ঞান করবেন না, ইলম আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, আপনার সামনে জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত, আপনি কুরআনের ইলম ও তার আমল শিখার ব্রত গ্রহণ করুন| আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ بَلۡ هُوَ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَۚ ۝٤٩ ﴾ [العنكبوت: ٤٩]

আপনার অন্তরে রয়েছে মহান কিতাব, পানির স্পর্শে যা মুছবে না। সহি মুসলিমে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন:

«إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ».

"আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি, যেন আপনাকে পরীক্ষা করি ও আপনার দ্বারা পরীক্ষা করি, এবং আপনার উপর এক কিতাব নাযিল করব, যা পানি মুঝে ফেলবে না, আপনি তা ঘুমন্ত ও

জাগ্রত অবস্থায় পড়বেন”।[1] পূর্ববর্তী কিতাবে কুরআনুল কারিমের প্রশংসা করা হয়েছে এভাবে:

«أناجيلهم في صدورهم».

“তাদের ইঞ্জিল রয়েছে তাদের অন্তরে”।

হে হাফিযে কুরআন, আপনি ঈর্ষার পাত্র আপনার সাথে ঈর্ষা করা বৈধ। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لا تَحَاسُدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالا فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ». رواه البخاري ٦٩٧٤

“দু’জন্য ব্যক্তি ব্যতীত কোনো হিংসা নেই, এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআন দান দিয়েছেন, সে দিন-রাতের বিভিন্ন অংশে তা তিলাওয়াত করে। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি বলে: যদি আমাকে দেওয়া হয় যেরূপ একে দেওয়া হয়েছে তাহলে আমি অবশ্যই করব যেরূপ সে করে। আর অপর ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, সে তা যথাস্থানে খরচ করে। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি বলে: যদি আমাকে দেওয়া হয় যেরূপ তাকে দেওয়া হয়েছে, আমিও তাতে করব যেরূপ সে করে”।[2] ঈর্ষা হচ্ছে অপরের

---

[1] মুসলিম: (২৮৬৭)

[2] বুখারি: (৬৯৭৪)

নিয়ামতের ন্যায় অনুরূপ নিয়ামত কামনা করা, কারো নিয়ামত ধ্বংস হোক কামনা করা নয়।

হে হাফিযে কুরআন, হে দুনিয়ার উতরুজ্জাহ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ».
رواه البخاري رقم ٥٠٠٧ ومسلم ١٣٢٨

“কুরআন পাঠকারী মুমিনের উদাহরণ হচ্ছে উতরুজ্জার উদাহরণ; যার ঘ্রাণ উত্তম এবং স্বাদও উত্তম”।[1]

ইবনে হাজার রহ. বলেন: বলা হয়, ঘ্রাণ ও খাদ্যের উপাদান বিশিষ্ট অন্যান্য ফল যেমন আপেল ইত্যাদি রেখে বিশেষভাবে উতরুজ্জার উদাহরণ পেশ করার হিকমত হচ্ছে, উতরুজ্জার ছিলকা দ্বারা চিকিৎসা করা হয়, তার দানা থেকে স্বাস্থ্যকর তৈল সংগ্রহ করা হয়। কেউ বলেন, জীন সে ঘরের নিকটবর্তী হয় না, যেখানে উতরুজ্জা রয়েছে; অতএব তার দ্বারা কুরআনের উদাহরণ পেশ করা যথাযথ হয়েছে, যার নিকটবর্তী শয়তান হয় না। উতরুজ্জার বীচির আবরণ সাদা, যা মুমিনের অন্তর সাদৃশ্য। তার আরো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন তার আকৃতি বড়, দেখতে সুন্দর,

[1] সহি বুখারি: (৫০২০), (৫৪২৭), (৫০৫৯), (৭৫৬০), মুসলিম: (৭৯৭)

আকর্ষণীয় রং, স্পর্শ করা আরামদায়ক, খেতে স্বাদ, হজম বর্ধক ও পেট পরিষ্কারক।

হে হাফিযে কুরআন, আপনি জানেন আপনার মর্যাদা কী? আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বর্ণনা করেন,

«الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ».

"কুরআনে পারদর্শী পুণ্যবান সম্মানিত মালায়েকাদের সঙ্গী।"[1]

السَّفَرَةِ (সাফারাহ) অর্থ দূত বা রাসূল, তারা আল্লাহর সংবাদ নিয়ে মানুষের নিকট আগমন করেন। কেউ বলেছেন, সাফারাহ অর্থ লেখক। আর الْبَرَرَةِ (বাররারাহ) অর্থ আনুগত্যকারী, আর الْمَاهِرُ (মাহির) অর্থ অভিজ্ঞ হাফিয, যার হিফয মজবুত ও তাজবিদ বিশুদ্ধ, তাই কুরআন পড়তে তার কোনো কষ্ট হয় না।

কাদি ইয়াদ রহ. বলেন, "সম্ভবত মালায়েকাদের সাথী হওয়ার অর্থ: আখিরাতে তার বিশেষ মর্যাদার স্থান, সেখানে সে ভ্রমণকারী মালায়েকাদের সঙ্গী হবে, কারণ আল্লাহর কিতাব ধারণ করার ক্ষেত্রে সেও তাদের গুণেগুণান্বিত। তিনি আরো বলেন, সম্ভবত মালায়েকাদের সঙ্গী হওয়ার অর্থ হাফিযে কুরআন তাদের ন্যায় কাজে লিপ্ত ও তাদের পথের পথিক"।[2]

---

[1] বুখারি: (৪৯৩৭) মুসলিম: (৭৯৮)

[2] কুরআনুল কারিমের হাফিয দুনিয়াতে আল্লাহর কালাম মুখস্থ করার কারণে কিয়ামতের দিন মালায়েকাদের সঙ্গী হবে, যারা আল্লাহর কালাম নিয়ে

‘মাহির’ অর্থ উত্তম ও অধিক সাওয়াবের অধিকারী, কারণ সে সাফারাহ মালায়েকাদের সঙ্গী, তার সাওয়াব অনেক, মাহির ব্যতীত কারো জন্য এ ফজিলত বর্ণনা করা হয়নি। যে আল্লাহর কিতাব হিফয করেনি, যথাযথ তার তিলাওয়াত করেনি, সে কিভাবে তার নাগাল পাবে! আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا».

“কুরআনের ধারককে বলা হবে, ‘তুমি পড় ও চড় এবং তারতীলসহ পড়, যেভাবে তারতীলসহ দুনিয়াতে পড়তে। কারণ, তোমার মর্যাদা সর্বশেষ আয়াতের নিকট, যা তুমি পড়বে।”[1]

কুরআনের ধারক ও তার উপর আমলকারীকে জান্নাতে প্রবেশ করার সময় বলা হবে তুমি মর্যাদার উচ্চ শিখরে উঠ এবং

মাখলুকের নিকট আগমন করত। অথবা তার অর্থ: হাফিযে কুরআনের আমল মালায়েকাদের আমলের ন্যায়। কারণ হাফযি কুরআন আল্লাহর কিতাব ধারণ করে, তার তিলাওয়াত করে ও তার শিক্ষা দেয়, ফলে সে বার্তাবাহক মালায়েকাদের ন্যায়। ‘সাফারাহ’ দ্বারা উদ্দেশ্য মালায়েকা। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে দু’টি বিশেষণ উল্লেখ করেছেন: ‘কিরাম’ ও ‘বারারাহ’। কিরাম অর্থ সম্মানিত; ‘বারারাহ’ অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যকারী ও ঈমানের দাবি পূরণে সত্যবাদী।

[1] আবু দাউদ: (১৪৬৪), তিরমিযি: (২৯১৪), আহমদ: (৬৭৬০)

ধীরেধীরে পড়, তাড়াহুড়ো কর না, যেভাবে দুনিয়াতে তাজবিদ ও ওয়াকফ ঠিক রেখে পড়তে, কারণ তোমার মর্যাদা হচ্ছে শেষ আয়াতের নিকট-যা তুমি পড়বে।

খাত্তাবি রহ. বলেন, কতক মনীষী বলেছেন, জান্নাতে মর্যাদার স্তরসমূহ হচ্ছে কুরআনুল কারিমের আয়াতের সংখ্যা অনুপাতে। কুরআনুল কারিমের তিলাওয়াতকারীকে বলা হবে, তুমি দুনিয়াতে যে পরিমাণ কুরআন পড়েছ সে পরিমাণ উঁচুতে চড়। যে পূর্ণ কুরআন পড়তে সক্ষম হবে সে জান্নাতের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হবে। আর যে কুরআনের অংশ বিশেষ পড়বে, তার মর্যাদা তার অংশ বিশেষের সমান হবে, যেখানে তার তিলাওয়াত শেষ সেখানে তার মর্যাদার সোপানও শেষ।

হে হাফিযে কুরআন, আপনাকে স্বাগতম, আপনি আল্লাহর কালাম দ্বারা স্বীয় অন্তরকে সতেজ করেছেন, আপনি তার ভোজসভার নিকটবর্তী হয়েছেন, এবার ইচ্ছামত গ্রহণ করুন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন:

«إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ فَاقْبَلُوا مِنْ مَأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

“নিশ্চয় এ কুরআন আল্লাহর দস্তরখান/ ভোজসভা, তোমরা তোমাদের সাধ্যমত তার ভোজসভা থেকে গ্রহণ কর”।

হে হাফিযে কুরআন, আপনি বরকতময়, আপনার নিয়ত বিশুদ্ধ হলে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবেন। আবু উমামাহ রা. বলতেন,

«اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يُعَذِّبَ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ». رواه الدارمي ٣١٨٥

"তোমরা কুরআন পড়, তোমাদেরকে এসব মুসহাফ যেন ধোঁকায় পতিত না করে, কারণ আল্লাহ এমন অন্তরকে শাস্তি দিবেন না যে কুরআন আত্মস্থ করেছে"।[1]

হে হাফিযে কুরআন, আপনার জন্য শুভসংবাদ, কুরআন আপনার জন্য সুপারিশ করবে এবং আপনাকে উন্নত পোশাক পরাবে, যদি আপনি তার উপর অটল থাকেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ

---

[1] দারামি: (৪/২০৯২), (৩১৮৫), এ হাদিস যদিও মাওকুফ তথা সাহাবির বাণী, কিন্তু তার হুকুম মারফু হাদিসের ন্যায়, কারণ এ জাতীয় সংবাদ একজন সাহাবি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে বলবেন এটাই স্বাভাবিক, যেহেতু সংবাদটি অদৃশ্য জগত সম্পৃক্ত। হাদিসটির মারফু সনদও রয়েছে, কিন্তু সেগুলো হাদিস যাচাইয়ের মানদণ্ডে বিশুদ্ধ নয়।

فَيُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً». رواه الترمذي ٢٨٣٩ وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

"কিয়ামতের দিন কুরআন এসে বলবে: হে আমার রব, তাকে পরিধান করান, ফলে তাকে সম্মানের টুপি পড়ানো হবে। অতঃপর বলবে: হে আমার রব, তাকে বৃদ্ধি করে দিন, ফলে তাকে সম্মানের অলঙ্কার পড়ানো হবে, অতঃপর বলবে: হে আমার রব তার উপর সন্তুষ্ট হোন, ফলে তিনি তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর তাকে বলা হবে: পড় ও উপড়ে চর, তার জন্য প্রত্যেক আয়াতের মোকাবিলায় একটি করে নেকি বর্ধিত করা হবে"।[1]

হে হাফিযে কুরআনের জননী, আপনার সন্তানের কারণে আপনি শুভসংবাদ গ্রহণ করুন। বুরাইদাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসে ছিলাম, অতঃপর তাকে বলতে শুনলাম:

«تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ (أي السحرة) قَالَ ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ يُظِلانِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ

---

[1] তিরমিযি: (২৯১৫), তিরমিযি রহ. হাদিসটি হাসান ও সহি বলেছেন, হাদিসটি প্রকৃত পক্ষে হাসান এবং বুখারি ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক। আলবানি রহ. সহি আল-জামে গ্রন্থে হাদসিটি হাসান বলেছেন: (৮০৩০)

عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُولُ لَهُ هَلْ تَعْرِفُنِي فَيَقُولُ مَا أَعْرِفُكَ فَيَقُولُ لَهُ هَلْ تَعْرِفُنِي فَيَقُولُ مَا أَعْرِفُكَ فَيَقُولُ أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لا يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُولانِ بِمَ كُسِينَا هَذِهِ فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِي دَرَجَةِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا فَهُوَ فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ هَذًّا كَانَ أَوْ تَرْتِيلا». رواه الإمام أحمد ٢١٨٩٢ وحسنه ابن كثير وهو في السلسلة الصحيحة للألباني ٢٨٢٩

“তোমরা সূরা বাকারা শিখ, কারণ তা শিক্ষা করা বরকত এবং তা ত্যাগ করা অনুশোচনা, যাদুকর তা শিখতে সক্ষম নয়। বুরায়দাহ রা. বলেন, তিনি কিছু সময় চুপ থাকলেন, অতঃপর বললেন, তোমরা সূরা বাকারা ও সূরা আলে-ইমরান শিখ, কারণ তারা উভয় দু’টি উজ্জ্বল বস্তু, কিয়ামতের দিন দু’টি মেঘের মত, অথবা দু’টি ছায়ার মত, অথবা সারিবদ্ধ পাখিদের দু’টি ডানার মত তাদের ধারকদেরকে তারা ছায়া দিবে। নিশ্চয় কুরআন কিয়ামতের দিন তার সাথীর সাথে সাক্ষাত করবে, যখন মলিন ব্যক্তির উপর থেকে কবর বিদীর্ণ করার ন্যায় তার সাথীর উপর থেকে কবর বিদীর্ণ করা হবে। কুরআন তাকে বলবে: তুমি আমাকে চিন, সে বলবে: আমি তোমাকে চিনি না, অতঃপর বলবে: তুমি আমাকে চিন? সে বলবে: আমি তোমাকে চিনি না, অতঃপর সে বলবে:

আমি তোমার সাথী কুরআন, আমি তোমাকে ভর দুপুরে ক্ষুধার্ত রেখেছি, তোমার রাত জাগ্রত রেখেছি। আজ প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসার পশ্চাতে চলবে, আর তুমি প্রত্যেক ব্যবসার পশ্চাতে চলবে। অতঃপর তার ডান হাতে রাজত্ব ও বাম হাতে স্থায়িত্ব প্রদান করা হবে এবং তার মাথায় সম্মানের মুকুট রাখা হবে। তার পিতা-মাতাকে দু'টি পোশাক পরিধান করানো হবে, দুনিয়াবাসী যার মূল্য দিতে অক্ষম। তারা বলবে, কিসের বিনিময়ে আমাদেরকে এ পোশাক পরিধান করানো হল, বলা হবে তোমাদের সন্তান কুরআন ধারণ করেছে তাই। অতঃপর তাকে বলা হবে পড় এবং জান্নাতের স্তর ও তার রুমগুলোতে আরোহণ কর, সে যতক্ষণ পড়তে থাকবে উপড়ে চড়তে থাকবে, দ্রুত পড়ুক বা ধীরে পড়ুক"।

হে হাফিযে কুরআন, মর্যাদার শিখরে পৌঁছার তুলনায় মর্যাদার শিখরে ধরে রাখা কঠিন। আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا».

رواه البخاري ٤٦٤٥

“তোমরা কুরআন বারবার পড়, সেই সত্তার কসম-যার হাতে আমার জীবন, রশি থেকে উটের পলায়ন করার চেয়েও কুরআন দ্রুত পলায়নপর।”[1]

تَعَاهَدُ (তাআহুদ) অর্থ অপরের সাথে কুরআনুল কারিমের দাওর ও রীতিমত তার তিলাওয়াত করা। তিলাওয়াত করে ও অপরকে শুনিয় কুরআন চর্চার ক্ষেত্রে তোমরা শিথিলতা কর না। উটকে বেঁধে রাখা না হলে উট পলায়ন করবে এটাই তার স্বভাব। অনুরূপ হাফিযে কুরআন যদি বারবার কুরআন তিলাওয়াত না করে কুরআন ধরে রাখতে পারবে না, বরং উটের চেয়ে দ্রুত তার অন্তর থেকে কুরআন পলায়ন করবে। ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন, এ হাদিস দু’টি আয়াতের সমার্থক:

﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝٥ ﴾ [المزمل: ٥]

“নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি এক অতিভারী বাণী নাযিল করেছি”।

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۝١٧ ﴾ [القمر: ١٧]

আর আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য”।

হাদিসটি এ দু’টি আয়াতের অর্থ দিচ্ছে, যে তিলাওয়াত করে ও অপরকে শুনিয়ে কুরআন ধরে রাখবে তার জন্য কুরআন সহজ,

---

[1] বুখারি: (৪৬৪৫)

আর যে কুরআন থেকে বিমুখ হবে তার থেকে কুরআন দ্রুত পলায়ন করবে"। ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَثَلُ الْقُرْآنِ مَثَلُ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ تَعَاهَدَهَا صَاحِبُهَا بِعُقُلِهَا أَمْسَكَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ أَطْلَقَ ذَهَبَتْ».

"কুরআনের উদাহরণ হচ্ছে বাঁধা উটের ন্যায়, যদি তার মালিক তাকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখে আয়ত্তে রাখতে পারবে, আর ছেড়ে দিলে চলে যাবে"।[1]

হে হাফিযে কুরআন, আপনি নিজেকে মর্যাদার উঁচু স্তর থেকে নিচুতে নিক্ষেপ করবেন না। ইবনে হাজার রহ. বলেন: "কুরআন ভুলে যাওয়ার বিধান কি এ সম্পর্কে আহলে-ইলমগণ দু'টি মত পোষণ করেছেন, কেউ বলেছেন কবিরা গুনাহ। দাহহাক ইবনে মুজাহিম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি কুরআন পড়ে যদি ভুলে যায়, অবশ্যই সেটা তার পাপের কারণে, কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖ ٣٠ ﴾ [الشورى: ٣٠]

"তোমাদের যে মুসিবত পৌঁছে সেটা তোমাদের হাতের উপার্জন"।[1] কুরআনুল কারিম ভুলে যাওয়ার চেয়ে বড় মুসিবত আর নেই।

---

[1] বুখারি: (৫০৩১)

আবুল আলিয়াহ রহ. বলেন, কোনো ব্যক্তির কুরআন হিফয করার পর গাফিলতির কারণে তা ভুলে যাওয়াকে আমরা কবিরাহ গুনাহ মনে করতাম।[2] ইবনে সিরিন থেকে সহি সনদে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে ভুলে যেত, তাকে তারা অপছন্দ করতেন এবং তার ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করতেন... তিলাওয়াত ত্যাগ করা কুরআন ভুলে যাওয়ার অন্যতম কারণ, আর কুরআন ভুলে যাওয়া প্রমাণ করে সে কুরআন আঁকড়ে ধরেন... আর কুরআন আঁকড়ে না ধরার অর্থ মূর্খতার দিকে ফিরে যাওয়া, ইলম অর্জন করার পর মূর্খতার দিকে ফিরে যাওয়া খুব খারাপ। ইসহাক ইবনে রাহওয়েহ বলেছেন, চল্লিশ দিন অতিবাহিত হবে কিন্তু কুরআন পড়বে না এটা খুব খারাপ কথা"।

হে হাফিযে কুরআন, কুরআন নিয়ে কিয়াম কর, কুরআন অধিক পাঠ কর, তাহলে কুরআনসহ বেঁচে থাকবে। যাহাবি রহ. বর্ণনা করেছেন, আবু আব্দুল্লাহ বিশর বলেন, আমি আবু সাহাল ইবনে জিয়াদ থেকে পারঙ্গম কাউকে দেখেনি, যে কুরআনের কোনো আয়াত শ্রবণ করার সাথে সাথে বলতে সক্ষম। তিনি আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন, রীতিমত সালাত আদায় করতেন ও তিলাওয়াত

[1] সূরা শুরা: (৩০)

[2] সনদ জায়েদ।

করতেন, অধিক তিলাওয়াতের কারণে কুরআন তার নখদর্পণে ছিল।

হে হাফিযে কুরআন, আপনি কুরআনকে অন্তরে ধারণ করেছেন, এবার তার দ্বারা আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করুন। কুরতুবি রহ. স্বীয় তাফসির গ্রন্থে বলেন, কুরআনুল কারিমের ধারক ও ইলম অন্বেষণকারী আল্লাহকে ভয় করুন, একনিষ্ঠভাবে তার জন্য আমল করুন, যদি অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো কাজ সংঘটিত হয়, সাথে সাথে তওবা করুন, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করুন ও নিয়তকে খাঁটি করুন। হাফিযে কুরআন যেমন অধিক মর্যাদার অধিকারী, অনুরূপ তার দায়িত্বও অনেক।

হে হাফিযে কুরআন, হিফযের অহমিকায় আমল ত্যাগ করা শুভ বুদ্ধির কাজ নয়, কারণ কাতাদাহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«المؤمن الذى يقرأ القرآن ويعمل به مع السّفرة الكرام البررة».

"যে মুমিন কুরআন পড়ে ও তার উপর আমল করে সে সম্মানিত, পুণ্যবান মালায়েকাদের সঙ্গী"। এ হাদিসে বলছে শুধু হিফয করা উক্ত ফজিলতের জিম্মাদার নয়, তার সাথে আমল অবশ্যই থাকা জরুরি। অতএব মালায়েকাদের সঙ্গী সে ব্যক্তি হবে, যে কুরআনুল কারিম পড়ে ও তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলে।

হে হাফিযে কুরআন, আপনার সিনায় কুরআন বিদ্যমান, আপনি তার মর্যাদা রক্ষা করুন, তার হক আদায় করুন ও তাকে যথাযথ

সম্মান দিন। আপনি যেরূপ কুরআন হিফয করে মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন, অনুরূপ আপনার দায়িত্ব বেড়ে গেছে বহুগুণ। কারণ, হিফয কোনো পদক নয়, যা দেখার জন্য সংরক্ষণ করা হয়, কিংবা কোনো সার্টিফিকেট নয় যা ফ্রেমে বাঁধাই করে করা হয়, কোনো পুরস্কার নয় যা স্মৃতি হিসেবে হিফাজত করা হয়, বরং একটি আমানত যার দাবি আদায় করা অবশ্য কর্তব্য।

হে হাফিযে কুরআন, ভালো পোশাক ও সর্বোত্তম আখলাক গ্রহণ করুন। ফুদায়েল ইবনে আয়াদ রহ. বলেন, কুরআনুল কারিমের হাফিয ইসলামের ঝাণ্ডার ধারক, তার পক্ষে সমীচীন নয় হাসি-ঠাট্টাকারীদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করা, অযথা রাত জাগরণ করে নির্ঘুম থাকা, বেহুদা কর্মে লিপ্ত হয়ে সময় নষ্ট করা, বরং কুরআনুল কারিমের দাবি মোতাবেক জীবন পরিচালিত করা।

কুরআনুল কারিম অন্তরে দৃঢ়তা আনে এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে সাহায্য করে। মুসলিমরা যখন মুসায়লামাতুল কাযযাবের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তাদের ঝাণ্ডাবাহী জায়েদ ইবনে খাত্তাব শাহাদাত বরণ করেন, তারপর ঝাণ্ডা গ্রহণ করার জন্য আবু হুযায়ফার মাওলা সালেম অগ্রসর হন, কতক মুসলিম তাকে বলল, হে সালেম আমরা আশঙ্কা করছি আপনার দিক থেকে আমরা হামলার শিকার হব, তিনি বললেন, আমার দিক থেকে তোমরা হামলার শিকার হলে আমি কুরআনের ধারক হতভাগা।

অতঃপর তনিা বীরত্বের সাথে সামনে অগ্রসর হোন, তার ডান হাত কাটা পড়ল তিনি বাম হাত দ্বারা ঝাণ্ডা ধারণ করলেন, তার বাম হাত কাটা পড়ল, তিনি গর্দান দ্বারা ঝাণ্ডা তুলে ধরলেন, তখন তিনি বলতে ছিলেন,

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ [ال عمران: ١٤٤]

﴿وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ﴾ [ال عمران: ١٤٦]

“আর মুহাম্মদ কেবল একজন রাসূল”।[1] “আর কত নবী ছিল, যার সাথে থেকে অনেক আল্লাহওয়ালা লড়াই করেছে”।[2] যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তার সাথীদের জিজ্ঞাসা করা হল, আবু হুযায়ফা কি করেছে? বলা হল, তিনি শহীদ হয়েছেন।

হে হাফিযে কুরআন, যারা হাফিয নয়, তাদের উপর অহংকার করা থেকে বিরত থাকুন, কখনো অল্প হিফযের অধিকারী ইখলাসের কারণে পূর্ণ হিফযের অধিকারী অহংকারীর উপর প্রাধান্য নিয়ে যায়।

হে হাফিযে কুরআন, মানুষের প্রশংসা আশা করবেন না, তাদের গুণকীর্তন দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। এ কথা ঠিক যে, হাফিয কুরআনকে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করা। ইবনে আব্দুল

---

[1] সূরা আলে-ইমরান: (১৪৪)

[2] সূরা আলে-ইমরান: (১৪৬)

বারর রহ. বলেন, কুরআনের ধারকগণ আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত ও তার নূর দ্বারা পরিবেষ্টিত, যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করল সে আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব করল, যে তাদের সাথে শত্রুতা করল সে আল্লাহর হককে ছোট করে দেখল। 'আল-ফাওয়াকিহুদ দানি'র লেখক বলেন, আলেম ও কুরআনুল কারিমের ধারকদের গীবত করা অন্যদের গীবতের তুলনায় অধিক জঘন্য"। অতএব কুরআনুল কারিমের ধারক কারো থেকে কখনো অধিকার ও সম্মান দাবি করবে না, এ আকাঙ্ক্ষা তাকে ইখলাস বিহীন করে দিতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: হিফয বিভাগ

*এ অধ্যায়ে আমরা কুরআনুল কারিমের পাঠদান কেন্দ্র 'তাহফিযুল কুরআনিল কারিম মাদ্রাসা' সম্পর্কে তিনটি বিষয় স্পষ্ট করার চেষ্টা করব। **ক. হিফয বিভাগ পরিচিতি।** এ থেকে হিফয বিভাগ বা হিফয মাদ্রাসা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা লাভ হবে। **খ. লাইফ স্কুল কর্তৃক পরিচালিত হিফয বিভাগ।** এ থেকে বাংলা, ইংলিশ কিংবা ক্যাডেট সিস্টেমে পরিচালিত প্রাইভেট স্কুল বা মাদ্রাসাসমূহে পরিচালিত হিফয বিভাগ সম্পর্কে ধারণার সৃষ্টির হবে। **গ. সাধারণ হিফয খানা।** এ থেকে ভারত উপমহাদেশ তথা ভারত-পাকিস্তান ও বাংলাদেশে কওমি দ্বারায় পরিচালিত হিফয বিভাগ বা হাফেযি মাদ্রাসা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে, ইনশাআল্লাহ।*

আমাদের দেশে 'তাহফিযুল কুরআনিল কারিম মাদ্রাসা'কে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়, যেমন 'হিফয বিভাগ' বা 'হিফয শাখা' বা 'হিফয খানা' বা 'হাফেযি মাদ্রাসা' ইত্যাদি। সাধারণত বড় মাদ্রাসার অধীন 'কুরআনুল কারিম হিফয করার পৃথক শাখাকে 'হিফয বিভাগ' বা 'হিফয শাখা' বা 'হিফয খানা' বা হালাকাতুল কুরআনিল কারিম বলা হয়। হিফয করার স্বতন্ত্র মাদ্রাসাকে 'ফোরকানিয়া মাদ্রাসা' বা 'হাফেযি মাদ্রাসা' বা 'তাহফিযুল কুরআনিল কারিম' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

হিফয বিভাগ পরিচিতি

হিফয বিভাগের ছাত্র/ ছাত্রীর অর্থ সবার হিফয পড়া জরুরি নয়, বরং হিফযের উদ্দেশ্যে ভর্তি হওয়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে হিফয শাখার ছাত্র-ছাত্রী বলা হয়। সাধারণত প্রত্যেক হিফয শাখায় তিন প্রকার ছাত্র/ ছাত্রী থাকে: ক. হিফয গ্রুপ, খ. নাজেরা গ্রুপ, গ. নুরানী বা কায়েদা গ্রুপ। নিম্নে প্রত্যেক গ্রুপের পরিচয় পেশ করছি:

নুরানী বা কায়েদা গ্রুপ: নুরানী বা কায়েদা গ্রুপের ছাত্র/ ছাত্রীরা আরবি হরফ, হরকত, শব্দ ও বাক্য পড়তে শিখে। মুয়াল্লিম 'কায়েদা গ্রুপে'র জন্য সর্বপ্রথম একটি ভালো কায়েদা বেছে নিন। অতঃপর কায়েদা থেকে তাদেরকে আরবি হরফের পরিচয় ও তার বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দিন। প্রতিটি হরফের স্থানভেদে বিভিন্ন আকৃতি ও গঠনের পরিচয় প্রদান করুন। কালিমার শুরুতে, মধ্যবর্তী ও শেষ অবস্থার ভিত্তিতে কোনো হরফের দু'টি, কোনো হরফের চারটি আকৃতি হয়, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের তা আত্মস্থ করতে সাহায্য করুন। আরবি হরফ জানা শেষে প্রথম হরকত, অতঃপর ধীরেধীরে কায়েদার ধারাক্রম মোতাবেক শব্দ ও বাক্য শিক্ষা দিন।

তাজবিদের নিয়ম-কানুন শিখানোর চাইতে তাজবিদের সঠিক প্রয়োগ শিক্ষা দিন। ছাত্র/ ছাত্রী যদি ছোট ও প্রাথমিক অবস্থার হয়, তাদেরকে তাজবিদের নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন রয়েছে বুঝানো ঠিক নয়, আপনি বিশুদ্ধ উচ্চারণ করে তালিম দিন, আপনার উচ্চারণ থেকে তারা মাদ-গুন্না, ইযহার, ইদগাম ও ইকলাবের সঠিক প্রয়োগ শিখবে। উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষা দিন, যেমন কোনো শব্দে নুন সাকিন বা তানবীনের পর 'বা' হরফ থাকায় তাকে ইকলাবের উচ্চারণ শিখিয়েছেন। এ উদাহরণটি মুয়াল্লিম হিসেবে আপনি মনে রাখুন এবং শিক্ষার্থীকে এরূপ দু'চারটি উদাহরণ খুঁজে বের করতে বলুন। তাকে বলে দিন এরূপ হলে এভাবে উচ্চারণ করতে হয়। দ্বিতীয়বার যখন এ শব্দটি আসবে তাকে সঠিক উচ্চারণ করতে বলুন, ভুল হলে কায়দায় বিদ্যমান প্রথম শব্দটি খুঁজে দিন এবং সেখান থেকে উচ্চারণ শুদ্ধ করুন।

এভাবে ছোট-বাচ্চাদের নিয়ে সামনে অগ্রসর হলে তাজবিদের নিয়ম-কানুন মুখস্থ করার বাড়তি চাপ অনুভব করার পূর্বে তারা তাজবিদ শিখবে সন্দেহ নেই। কতক কায়দায় তাজবিদের নিয়মানুসারে হরফগুলো বিভিন্ন রং করা থাকে, বাচ্চাদের জন্য তা অধিক সহজ। আপনার প্রচেষ্টা ও শিক্ষার্থীর ধারাবাহিকতা পরস্পর সঙ্গী হলে চার থেকে ছয় মাসের মধ্যে কায়েদা শেষ হবে, ইনশাআল্লাহ।

বিশুদ্ধ কায়েদা: আমাদের দেশীয় 'নুরানী কায়েদা'-তে আরবি হরফের সঠিক সংখ্যা ও বিন্যাস যথাযথ নয়। আরবি হরফ ২৮-টি এবং বিন্যাস নিম্নরূপ:

خ	ح	ج	ث	ت	ب	أ
ص	ش	س	ز	ر	ذ	د
ق	ف	غ	ع	ظ	ط	ض
ي	و	ه	ن	م	ل	ك

উর্দু-ফারসির সংমিশ্রণের ফলে আমাদের দেশে আরবি হরফগুলো তার স্বতন্ত্র হারিয়েছে। সৌদি আরব থেকে প্রিন্টকৃত নুর মুহাম্মদ হক্কানী সাহেবের নুরানী কায়দাতেও আরবি হরফের সংখ্যা ও বিন্যাস ঠিক নেই, সেখানে আরবি হরফ ৩০টি রয়েছে, অন্যান্য কায়দায় সাধারণত ২৯-টি বিদ্যমান[1]। বস্তুত আরবি হরফ ২৮টি।[2] জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে হামযাহ ও আলিফ থেকে। এ দু'টি হরফকে মূল হরফ গণনা করায় হরফ সংখ্যা ২৯টি হয়েছে, অথচ আলিফ

---

[1] অধিকাংশ ভাষাবিদ বলেন, আরবি হরফ ২৮টি, এটাই প্রতিষ্ঠিত ও বিশুদ্ধ অভিমত, তবে কেউ কেউ ২৯টি বলেছেন।

[2] ফার্সি ভাষার 'ইয়া' আরবি হরফের সাথে যোগ করে কেউ কেউ আরবি হরফ ৩০টি বলেছেন, অথচ আরবিতে ইয়া একটি। ইয়া মাজহুল নামে কোনো ইয়া আরবিতে নেই।

মূল হরফ নয়। আলিফ হচ্ছে দীর্ঘ স্বর, যা ফাতহার (জবর) সাথে উচ্চারণ হয়। ফাতহার পর আলিফ হলে ফাতহার উচ্চারণ দীর্ঘ স্বর হয়, আলিফ না হলে ফাতহার উচ্চারণ হ্রস্ব স্বর হয়। অথবা বলুন, আলিফ হচ্ছে মাদের (দীর্ঘ স্বরের) হরফ| আরবিতে মাদের হরফ তিনটি: 'আলিফ', 'ওয়া' ও 'ইয়া'| 'দাম্মা'র পর মাদের হরফ 'ওয়া' হলে দাম্মার উচ্চারণ দীর্ঘ স্বর হয়; কাসরার পর মাদের হরফ 'ইয়া' হলে কাসরার উচ্চারণ দীর্ঘ স্বর হয়; ফাতহার পর মাদের হরফ আলিফ হলে ফাতহার উচ্চারণ দীর্ঘ স্বর হয়। দাম্মা, কাসরা ও ফাতহার পর মাদের হরফ 'আলিফ', 'ওয়া' ও 'ইয়া' না হলে তাদের উচ্চারণ হ্রস্ব স্বর হয়।

উল্লেখ্য, 'ওয়া' ও 'ইয়া' মূল বা স্বতন্ত্র হরফ হিসেবেও ব্যবহার হয়। অতএব 'ওয়া' ও 'ইয়া'র দু'টি মান: মূল হরফের মান ও হরফে ইল্লতের মান। তাই 'ওয়া' ও 'ইয়া'তে যদি দাম্মাহ, ফাতহা ও কাসরা হয় এবং তার পরে যদি মাদের হরফ না হয়, তাহলে তার উচ্চারণ হবে অন্যান্য হরফের ন্যায় হ্রস্ব স্বর| যদি তার পরে মাদের হরফ হিসেবে 'ওয়া', 'ইয়া' কিংবা আলিফ হয়, তাহলে তার উচ্চারণ হবে দীর্ঘ স্বর| আলিফ শুধু মদের হরফ হিসেবে উচ্চারণ হয়। তাই তার উপর হরকত শুদ্ধ নয়, কিংবা আলিফের উপর হরকত হলে তা আলিফ থাকে না, হামযাহ হয়ে যায়।

আরবি পরিভাষা ব্যবহার করুন: জের, জবর ও পেশ ফারসি পরিভাষার পরবর্তীতে আরবি পরিভাষা দাম্মাহ, ফাতহা, কাসরা, সুকুন ও শাদ্দাহ ব্যবহার করুন। বানান পদ্ধতি প্রয়োজনে কারো থেকে শিখে নিন, তবুও বাচ্চাদেরকে আরবি পরিভাষা দ্বারা কুরআনুল কারিম শিক্ষা দিন।

নাজেরা গ্রুপ: কায়েদা শেষ করে ছাত্র/ ছাত্রীরা নাজেরা গ্রুপে উত্তীর্ণ হয়। দেখে-দেখে কুরআনুল কারিম দ্রুত ও শুদ্ধভাবে পড়তে শিখাকে নাজেরা বলা হয়। নাজেরা পড়ুয়া ছাত্র/ ছাত্রীদের প্রতি মুয়াল্লিম অধিক যত্ন নিন, যেন যথাযথভাবে তারা তাজবিদের ব্যবহার ও তার সঠিক প্রয়োগ শিখে। শুরুতে তাদের কয়েকটি সূরা মুখস্থ করিয়ে নিন; যেমন সূরা ফাতিহা, নাস, ফালাক ও ইখলাস থেকে সূরা ফীল বা তাকাসুর পর্যন্ত সূরাসমূহ। অতঃপর ত্রিশতম পারা নাজেরা পড়ান। ত্রিশতম পারার নাজেরা শেষে মুয়াল্লিম সিদ্ধান্ত নিবেন ছাত্র/ ছাত্রী হিফয পড়বে-না আরো কয়েক পারা নাজেরা পড়বে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে তাদের ইচ্ছা ও রুচি জেনে নিন। যদি ছাত্র/ ছাত্রীর চাওয়া ও মুয়াল্লিমের অভিজ্ঞতা এক হয় খুব ভালো, অন্যথায় মুয়াল্লিমের অভিজ্ঞতার দাবি তাদেরকে বুঝিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বলুন।

হিফয পড়ার উপযুক্ত কোনো ছাত্র/ ছাত্রী নাজেরাহ পড়তে চাইলে বলুন, নাজেরাহ পড়ার অর্থ সময় নষ্ট করা ও পিছিয়ে পড়া;

কয়েক পড়া হিফয করলে তোমার তিলাওয়াতের ধীরগতি দূর হয়ে যাবে এবং যে কোনো স্থান থেকে তুমি বিনা জড়তায় পড়তে পারবে। অনুরূপ নাজেরা পড়ার উপযুক্ত কোনো ছাত্র/ ছাত্রী হিফয পড়তে চাইলে বলুন, নাজেরা দ্রুত না হলে হিফয গতিশীল হয় না। অতএব তোমার জন্য নাজেরা উত্তম।

নাজেরা পড়ার উপযুক্ত কোনো ছাত্র/ ছাত্রী হিফয পড়তে আগ্রহী হলে তাকে হিফয পড়ার সুযোগ দিন, তার হিম্মতকে ধন্যবাদ জানান ও তাকে সাহায্য করুন যেন প্রতি পৃষ্ঠা হিফয করার পূর্বে নাজেরা বিশুদ্ধ ও তিলাওয়াত গতিশীল করে নেয়।

এভাবে ছাত্র-শিক্ষকের গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত অবশ্যই অভিভাবককে অবহিত করুন, সন্তান বা প্রিয় পোষ্যের ইতিবাচক দিকগুলো অভিভাবকের সামনে তুলে ধরুন। অভিভাবক হাফেয বা গায়রে-হাফেয, পড়ুয়া বা আনপড় যে কেউ হোক তাকে কোনো তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে অবহেলা করা ঠিক নয়।

আমাদের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত, ছয়/ সাত বছরের একজন ছাত্র/ ছাত্রী চার থেকে পাঁচ বা ছয় মাস কায়েদা ও অবশিষ্ট ছয় মাস নাজেরা পড়ার পর দ্বিতীয় বছর হিফযের উপযোগী হয়, তবে মেধা ও মনোযোগিতার তারতম্যের কারণে কম-বেশী হওয়া স্বাভাবিক।

হিফয গ্রুপ: হিফয বিভাগের শিক্ষার্থীরা নাজেরা সমাপ্ত করে হিফয গ্রুপে উত্তীর্ণ হয়। আমাদের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত চার থেকে ছয় মাসের মধ্যে একজন শিক্ষার্থী কায়েদাহ সমাপ্ত করে নাজেরা গ্রুপে উত্তীর্ণ হয়। অতঃপর ছয় মাস নাজেরা পড়ার পর হিফয গ্রুপে উত্তীর্ণ হয়। সাধারণত কায়েদা ও নাজেরা গ্রুপে এক বছরের বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না। একজন শিক্ষার্থী যখন হিফযের উপযোগী হয়, তখন সে তাজবিদসহ কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করার যোগ্যতা অর্জন করে। অর্থাৎ সে আরবি হরফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ, মাদ ও গুন্নাসহ বিনা জড়তায় কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করতে সক্ষম হয়। কোথাও সামান্য জড়তা থাকলে ১/২ পড়ার ফলে তা দূর হয়ে যায়।

হিফয গ্রুপে উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীরা নাজেরা গ্রুপে থাকাবস্থায় সূরা ফীল থেকে সূরা নাস, কিংবা তার চেয়ে অধিক সংখ্যক সূরা মুখস্থ করেছে। অতএব এখন সে হুমাযাহ বা তার পরবর্তী মুখস্থ সূরার পর থেকে হিফয আরম্ভ করবে। প্রথম ত্রিশ, উনত্রিশ ও আটাশতম পারাসমূহ মুখস্থ করা ভালো, ইচ্ছা হলে ৫ থেকে ১০ পারাও মুখস্থ করা যায়। আবার সূরা বাকারা থেকে মুখস্থ শুরু করা কোনো সমস্যা নেই।

'লাইফ স্কুল' কর্তৃক পরিচালিত হিফয বিভাগ[1]

কুরআনুল কারিমের প্রতি গুরুত্বারোপের অংশ হিসেবে 'লাইফ স্কুল' পরিবার হিফয বিভাগ আরম্ভ করেছে। এতে প্রাতঃ-দুপুর ও রাত্রিকালীন তিন শিফটে তিন ঘণ্টা পাঠ দান করা হয়। একজন ছাত্র/ছাত্রী এক বা দু'শিফটে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পায়। একাডেমিক শিক্ষার নির্ঘণ্ট অনুগামী হিফয বিভাগ পরিচালিত হয়। বর্তমান একাডেমিক কার্যক্রম সকাল ৮:০০টায় আরম্ভ হয় এবং শেষ হয় বিকাল ২:২০মিনিটে। তার অনুগামী হিফয বিভাগের সময়সূচী ১-ম শিফট সকাল ৬:৫০ থেকে ৭:৫০; ২-য় শিফট বিকাল ২:৫০ থেকে ৩:৫০ এবং ৩-য় শিফট রাত ৮:০০ থেকে ৯:০০ পর্যন্ত। বর্তমান এভাবে চলছে, তবে মৌসুম পরিবর্তন অথবা ছাত্র ও অভিভাবকদের সুবিধা অথবা অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের পরামর্শ থেকে আরো সুবিধাজনক সময় পাইলে তাও গ্রহণ করা হবে, যদি একাডেমিক শিক্ষা ও তার নির্ঘণ্টের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

---

[1] উল্লেখ্য, এখান থেকে শুরু করে ১৬৬পৃষ্ঠা পর্যন্ত অর্থাৎ সাধারণ হিফয খানা সম্পর্কে আলোচনার পূর্ব পর্যন্ত পুরো বিষয় লাইফ স্কুল কর্তৃক পরিচালিত হিফয বিভাগের পরিচালক, শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক ও হোস্টেল সুপারদের উদ্দেশ্যে লিখা, তবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই সমানভাবে উপকৃত হবেন, ইনশাআল্লাহ। তাই পুরো আলোচনা এখানে উপাস্থাপন করলাম।

আবাসিক ছাত্রদের জন্য হিফয বিভাগে অংশ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক, অনাবাসিক ছাত্র/ ছাত্রীদের জন্য ঐচ্ছিক। কেউ এক শিফটে পড়তে চাইলে তার সুযোগও রয়েছে। হোস্টেলের ছাত্ররা সকাল ও রাতের শিফটে; অনাবাসিক ছাত্র/ ছাত্রীরা সকাল ও বিকাল শিফটে এবং এক শিফটে পড়তে ইচ্ছুক ছাত্র/ ছাত্রীরা কেউ সকাল, কেউ বিকাল শিফটে অংশ গ্রহণ করে, সুবিধা অনুযায়ী যে কোনো ছাত্র/ ছাত্রী এক বা সর্বাধিক দু'শিফটে পড়তে পারে।

লাইফ স্কুলের একাডেমিক ক্যালেন্ডার:

লাইফ স্কুল কর্তৃক পরিচালিত হিফয বিভাগ সম্পর্কে জানার পূর্বে তার একাডেমিক ক্যালেন্ডার জানা জরুরি, কারণ পুরো পরিকল্পনা একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুগামী। একাডেমিক ক্যালেন্ডার হিসেবে সর্বমোট ক্লাস ও ছুটির তালিকা নিম্নরূপ: রমদান ও ঈদুল ফিতরের ছুটি ৩২, ঈদুল আদহার ছুটি ১১, প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা ও তার পরবর্তী ছুটি ১৯, জানুয়ারিতে প্রিপারেটরি ছুটি ১৮, দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা ও তার পরবর্তী ছুটি ১৮, সরকারী ছুটি ৭, ছুটি ব্যতীত শুক্রবার ৩৬, (ক্যালেন্ডার বহির্ভূত) সম্ভাব্য ছুটি ৯; সর্বমোট ১৫০দিন ছুটি। অতএব হিফয পড়ানোর জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে আমরা (৩৬৫-১৫০=) ২১৫দিন, অর্থাৎ সাত মাস সময় পাই। শনিবার একাডেমিক ক্লাস বন্ধ থাকে, তবে হিফয

বিভাগ খোলা থাকে এবং সকাল ৮:০০-১০:৩০ পর্যন্ত একবার ক্লাস হয়। অতএব ৭-মাসে একজন ছাত্র/ ছাত্রী প্রতি শনিবার একসাথে ২:৩০ঘণ্টা ও অন্যান্য দিন সর্বাধিক দু'শিফট ক্লাস করার সুযোগ পায়।

হিফয করার মেয়াদ:

আরবি হরফ ঠিকভাবে পড়তে সক্ষম নয়, তবে মনোযোগী ও মধ্যম মেধার অধিকারী ৬/৭ বছর বয়সের একজন ছাত্র/ ছাত্রী অত্র হিফয বিভাগে ভর্তি হলে ১-ম বছরে কায়েদা ও নাজেরা শেষ করে ২-য় বছর হিফয গ্রুপে উত্তীর্ণ হবে ও অন্ততপক্ষে দুই পারা মুখস্থ করতে সক্ষম হবে। ৩-য় বছর তিন পারা, ৪-র্থ বছর পাঁচ পারা, ৫-ম বছর ছয় পারা, ৬-ষ্ঠ ও তার পরবর্তী ৭-ম বছর সাত পারা মুখস্থ করে পূর্ণ কুরআন হিফয করার গৌরব অর্জন করবে -ইনশাআল্লাহ-, যদি সে সকাল শিফটে নতুন হিফয ও পরবর্তী শিফটে পুরাতন হিফয বা মুরাজাআহ শোনায় এবং প্রতি ক্লাসে ৩০-৪০ মিনিট মনোযোগসহ পড়ে। স্কুলের পরিভাষা হিসেবে, কেজি ওয়ানের একজন ছাত্র/ ছাত্রী যদি ধারাবাহিকভাবে হিফয বিভাগে পড়ে, তাহলে গ্রেড ফাইভে উঠে সে পূর্ণ কুরআনুল কারিম হিফয করতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

অপর হালাকা/ হিফয বিভাগ থেকে নাজেরা শেষ করে আসা ছাত্র/ ছাত্রী যদি সকাল শিফটে ৫-লাইন করে নতুন হিফয ও পরবর্তী শিফটে মুরাজাআহ শোনায়, তাহলে ৫-৬ বছরে পূর্ণ কুরআনুল কারিম মুখস্থ করতে সক্ষম হবে। কোনো ছাত্র যদি প্রতিদিন সকাল শিফটে ৮-লাইন নতুন হিফয ও পরবর্তী শিফটে মুরাজাআহ শোনায়, তাহলে সে ৪-৫ বছরে পূর্ণ কুরআনুল কারিম হিফয করবে। কোনো ছাত্র/ ছাত্রী যদি ১-ম শিফটে এক-পৃষ্ঠা নতুন হিফয ও পরবর্তী শিফটে মুরাজাআহ শোনায়, তাহলে ৩-৪ বছরে পূর্ণ কুরআনুল কারিম হিফয করতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

হিফয শাখার একজন শিক্ষার্থী কিভাবে ১-ম বছর কায়েদা ও নাজেরা শেষ করে ২-য় বছর দুই পারা, ৩-য় বছর তিন পারা, ৪-র্থ বছর পাঁচ পারা, ৫-ম বছর ছয় পারা, ৬-ষ্ঠ বছর সাত পারা ও ৭-ম বছর পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করবে, নিম্নে তার একটি ধারণা পেশ করছি। মনে করি, আমাদের সামনে মধ্যম মেধার অধিকারী একজন ছাত্র/ ছাত্রী রয়েছে, যার বয়স সাত এবং সে কেজি টুতে পড়ে। কেজি ওয়ানে তথা হিফয শাখার প্রথম বছর সে কায়েদাহ ও নাজেরা শেষ করে সূরা ফীল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত মুখস্থ করেছে; ২-য় বছর সে দু'শিফটে পড়বে। সাধারণত প্্রথম শফিটে নতুন হিফয ও দ্বিতীয় শিফটে মুরাজাআহ শোনাবে।

প্রথম চার মাসে পূর্ণ ১-পারা অর্থাৎ ৩০-তম পারা মুখস্থ করার চার্ট দেখুন:

প্রথম মাস: সূরা হুমাযাহ থেকে সূরা লাইল পর্যন্ত মুখস্থ করবে:

বার	শনিবার	রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	
সকাল শিফট	হুমাজাহ: ১-৪	হুমাজাহ ৫-৯	আসর ১-৩	তাকাসুর ১-৪	তাকাসুর ৫-৮	কারিয়াহ ১-৫	প্রথম সপ্তাহ
বিকাল শিফট	তাজবীদ	মু.নাস-ইখলাস	মু.লাহাব-কাফিরুন	মু.কাউসার-মাউন	মু.কুরাইশ-ফিল	মু. হুমাজাহ	
সকাল শিফট	কারিয়াহ৬-১১	আদিয়াত ১-৬	আদিয়াত৭-১১	জিলজাল ১-৪	জিলজাল ১-৮	বায়্যিনাহ ৪-৫	দ্বিতীয় সপ্তাহ
বিকাল শিফট	তাজবীদ	মু.আসর-তাকাসুর	কারিয়াহ	জিলজাল ৫-৭	বায়্যিনাহ ১-৩	বায়্যিনাহ ৬-৭	
সকাল শিফট	বায়্যিনাহ ৮	মু.বায়্যিনাহ ১-৫	কাদর ১-৩	ইকরা ১-৫	ইকরা ১১-১৫	মু.ইকরা ১-১৯	তৃতীয় সপ্তাহ
বিকাল শিফট	তাজবীদ	মু.বায়্যিনাহ ১-৮	কাদর ৪-৫	ইকরা ৬-১১	ইকরা ১৬-১৯	সূরা তীন ১-৫	
সকাল শিফট	সূরা তীন৬-৮	ইনশিরাহ ১-৫	ইনশিরাহ ১-৮	দোহা ৭-১১	লাইল ৭-১১	লাইল ১৭-২১	চতুর্থ সপ্তাহ
বিকাল শিফট	তাজবীদ	মু.সূরা তীন ১-৮	দোহা ১-৬	লাইল ১-৬	লাইল ১২-১৬	মু.লাইল ১-২১	

দ্বিতীয় মাস: সূরা শামস থেকে সূরা আলা পর্যন্ত মুখস্থ করবে:

বার	শনিবার	রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	
সকাল শিফট	শামস ১-৬	শামস ৭-১২	শামস ১৩-১৫	বালাদ ১-৫	বালাদ ৬-১৫	বালাদ ১৬-২০	প্রথম সপ্তাহ
বিকাল শিফট	তাজবীদ	মু.হুমাজাহ-নাসর	মু. শামস	মু.তাকাসুর	মু.কারিয়াহ	মু.আদিয়াত	
সকাল শিফট	মু.বালাদ ১-২০	ফাজর ১-৬	ফাজর ৭-১১	ফাজর ১২-১৫	ফাজর ১৬-১৮	ফাজর ১৯-২৩	দ্বিতীয় সপ্তাহ
বিকাল শিফট	তাজবীদ	মু.জিলজাল	মু.বায়্যিনাহ	মু.কাদর	মু.ইকরা	মু.তীন	
সকাল শিফট	ফাজর ২৪-৩০	মু.ফাজর ১-১৬	মু.ফাজর১৭-৩০	গাশিয়াহ ১-৬	গাশিয়াহ ৭-১৫	গাশিয়াহ১৬-২০	তৃতীয় সপ্তাহ
বিকাল শিফট	তাজবীদ	মু.ইনশিরাহ	মু.দোহা	মু.লাইল	মু.শামস	মু.বালাদ	
সকাল শিফট	গাশিয়াহ২১-২৬	মু.গাশিয়াহ ১-১৯	আলা ১-৭	আলা ৮-১৪	আলা ১৫-১৯	মু.আলা পূর্ণ	চতুর্থ সপ্তাহ
বিকাল শিফট	তাজবীদ	মু.গাশিয়াহ পূর্ণ	মু.ফাজর ১-১৬	মু.ফাজর১৭-৩০	মু.ফাজর১-৩০	মু. গাশিয়াহ	

তৃতীয় মাস: সূরা তারিক থেকে সূরা তাকবির পর্যন্ত মুখস্থ করবে:

বার	শনিবার	রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	
সকাল শিফট	তারিক ১-৬	তারিক ৭-১২	তারিক ১৩-১৭	বুরুজ ১-৮	বুরুজ ৯-১১	বুরুজ ১২-২২	প্রথম সপ্তাহ
বিকাল শিফট	তাজবীদ	মু.কারিআহ	মু.আদিয়াত	মু.তারিক পূর্ণ	মু.বায়্যিনাহ	মু.কাদর	
সকাল শিফট	মু.বুরুজ পূর্ণ	ইনশিকাক ১-৬	ইনশিকাক৭-১৩	ইনশিকাক ১৪-২১	ইনশিকাক২২-২৫	মু.ইনশিকাক	দ্বিতীয় সপ্তাহ
বিকাল শিফট	তাজবীদ	মু.ইকরা	মু.তীন	মু. ইনশিরাহ	মু.দোহা	মু.লাইল	
সকাল শিফট	মুতাফফিফিন১-৮	মুতাফফিফিন৯-১৪	মুতাফফিফিন১৫-২২	মুতাফফিফিন২৩-২৮	মুতাফফিফিন২৯-৩৩	মুতাফফিফিন৩৪-৩৬	তৃতীয় সপ্তাহ
বিকাল শিফট	তাজবীদ	মু.শামস	মু.বালাদ	মু. ফাজর	মু. গাশিয়াহ	মু. আলা	
সকাল শিফট	মু.মুতাফফিফিন১-২১	মু.মুতাফফিফিন২২-৩৬	ইনফিতার১-১১	ইনফিতার১২-১৯	তাকবির ১-১০	তাকবির১১-২১	চতুর্থ সপ্তাহ
বিকাল শিফট	তাজবীদ	মু. মুতাফফিফিন	মু.তারিক	মু.ইনফিতার	মু.বুরুজ	মু.ইনশিকাক	

চতুর্থ মাস: সূরা আবাসা থেকে সূরা নাবা পর্যন্ত মুখস্থ করবে:

বার	শনিবার	রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	
সকাল শিফট	তাকবির২২-২৯	আবাসা ১-১১	আবাসা ১২-২২	আবাসা২৩-৩৩	আবাসা৩৪-৪২	মু.আবাসা২১-৪২	প্রথম সপ্তাহ
বিকাল শিফট	তাজবীদ	মু.মুতাফফিফিন১-২১	মু.মুতাফফিফিন২০-৩৬	মু.মুতাফফিফিন	মু.আবাসা১-২০	মু.ইনফিতার	
সকাল শিফট	মু.আবাসা১-৪২	নাজিআত১-১০	নাজিআত১১-১৮	নাজিআত১৯-২৬	নাজিআত২৭-৩৪	নাজিআত৩৫-৪১	দ্বিতীয় সপ্তাহ
বিকাল শিফট	তাজবীদ	মু.তাকবির	মু.আবাসা	মু.লাইল-শামস	মু.বালাদ	মু.ফাজর	
সকাল শিফট	নাজিআত ৪২-৪৬	মু.নাজিআত১-২৬	মু.নাজিআত পূর্ণ	নাবা ১-১০	নাবা ১১-১৮	নাবা ১৯-২৫	তৃতীয় সপ্তাহ
বিকাল শিফট	তাজবীদ	মু.গাশিয়াহ	মু.আলা	মু.তারিক	মু.বুরুজ	মু.ইনশিকাক	
সকাল শিফট	নাবা ২৬-৩৪	নাবা ৩৫-৩৮	নাবা ৩৭-৪০	মু.নাবা ১-২৩	মু.নাবা ২৪-৪০	মু.নাবা পূর্ণ	চতুর্থ সপ্তাহ
বিকাল শিফট	তাজবীদ	মু.মুতাফফিফিন	মু.ইনফিতার	মু.তাকবির	মু.আবাসা	মু.নাজিআত	

মু. আরবি مراجعة শব্দের সংক্ষেপ, অর্থ পিছনের পড়া। ভারত উপমহাদেশের হিফয খানায় 'মুরাজাআহ'র সমার্থক 'আমুখতাহ' ফারসি শব্দ ব্যবহার করা হয়, অর্থ রিভিশন বা পিছনের পড়া। মুরাজা'আহ ব্যতীত হিফয ধরে রাখা সম্ভব নয়, তাই হিফযের ছাত্রদের রুটিনে অবশ্যই 'মুরাজা'আহ' থাকে। আমাদের হালাকায় মুরাজা'আর উপযুক্ত সময় ২-য় শিফট, সকাল শিফট নতুন হিফযের জন্য বেশী উপযোগী।

মধ্যম মেধার অধিকারী একজন শিক্ষার্থীর সামর্থ্য মোতাবেক চার্ট দ্বারা একটি ধারণা পেশ করলাম। ১-ম মাসের প্রথম সপ্তাহের

শনি ও রবিবার দেখুন, সূরা হুমাজাকে দু'দিনের সবকে ভাগ করা হয়েছে। মুয়াল্লিম চাইলে রবিবার সূরা হুমাজার (৫-৯) আয়াত শ্রবণ করে অত্র সূরার (১-৪) আয়াত শুনে নিন, তাহলে সবকের সাথে মুরাজা'আর কাজও শেষ হয়। আবার চতুর্থ সপ্তাহের রবিবার সকাল দেখুন, নিয়মানুযায়ী তাতে সূরা তীন 'মুরাজাআহ' শুনানোর পালা, কিন্তু সেটা বিকালে রেখে সকালে সূরা ইনশিরাহ পড়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, নতুন সবকের জন্য সকালের মুহূর্তগুলো অধিক উপযুক্ত।

তৃতীয় মাসের তৃতীয় সপ্তাহের বৃহস্পতিবার দেখুন, সকাল শিফটে সূরা মুতাফফিফিনের শুধু শেষ দুই লাইন রাখা হয়েছে, অন্যান্য দিনের তুলনায় যা অর্ধেক। তাই মুয়াল্লিম ছাত্র/ ছাত্রীকে তাগিদ করুন, যেন দ্রুত সবক শুনায় ও পরবর্তী ক্লাসে পূর্ণ সূরা মুরাজাআহ শুনানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করে। লক্ষ্য করুন, মুতাফফিফিনের জন্য সবক পরবর্তী 'মুরাজাআ'র তিনটি ক্লাস রেখেছি, কিন্তু ছাত্র/ ছাত্রী যদি মনোযোগী হয় এবং মুয়াল্লিম তাদের প্রতি অধিক যত্নশীল হন, তাহলে অনেক শিক্ষার্থী এক শিফটে পূর্ণ সূরা 'মুরাজাআহ' শুনাতে সক্ষম। এভাবে পড়াশুনা হলে ইনশাআল্লাহ ধীরেধীরে সামনে আগামে এবং পিছনের পড়াও মনে থাকবে। পিছনের পড়া মুখস্থ থাকলে ছাত্র/ ছাত্রীরা সামনে পড়তে উৎসাহ বোধ করে, তাই মুয়াল্লিম নতুন সবকের সাথে

পিছনের পড়ার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য রাখুন এবং তাদেরকে সুন্নত ও নফল সালাতে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করার উপদেশ দিন।

প্রথম মাসের ১ম শিফটের প্রতি ক্লাসে দু'লাইন, দ্বিতীয় মাসের ১ম শিফটের প্রতি ক্লাসে তিন লাইন এবং তৃতীয় চতুর্থ মাসের ১ম শিফটের প্রতি ক্লাসে চার লাইন হিসেব করা হয়েছে। ২য় শিফট মুরাজাআর জন্য নির্ধারিত, বিশেষ ক্ষেত্র বা প্রয়োজন ব্যতীত তার উল্টো না করাই ভালো। পরবর্তী তিন মাস ১-ম শিফটে যদি ৪-লাইন করে হিফয শুনায়, তাহলে এক-পারা চার-পৃষ্ঠা হিফয হবে, ৫-লাইন করে শোনালে দেড়-পারা হিফয হবে, কিন্তু আমরা এক পারা হিসেব করেছি।

প্রথম বছর একজন ছাত্র/ ছাত্রী যতটুকুন সময়ে ৪-লাইন মুখস্থ করবে, পরবর্তী বছর একই সময়ে ৫-লাইন মুখস্থ করবে খুব সহজে। অতএব বছর শেষে তিন থেকে সাড়ে তিন-পারা মুখস্থ হবে, আমরা তিন পারা হিসেব করেছি। ২-য় শিফটে অবশ্যই পিছনের পড়া শোনাবে। পরবর্তী বছর একই সময়ে ৭-লাইন মুখস্থ করতে সক্ষম হবে, তাহলে বছর শেষে ৫-পারা মুখস্থ হবে। তার পরবর্তী বছর এক সময়ে ১০লাইন মুখস্থ করতে সক্ষম হবে, তাহলে বছর শেষে ৭-পারা মুখস্থ হবে, কিন্তু হিসেব করেছি ছয় পারা। তার পরবর্তী বছর ১০-লাইন করলে ৭-পারা হিফয হবে।

তার পরবর্তী বছর ৭ পারা মুখস্থ করলে ৩০পারা পূর্ণ হবে। হিফযের শেষ পর্যায়ে যদিও মুখস্থ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, তবে পিছনের মুরাজাআর চাপ থাকে, তাই ৭-পারা হিসেবে করেছি। অতএব মুয়াল্লিমগণ হিফযের সংখ্যা কম রেখে পিছনের পড়ার দিকে অধিক মনোযোগ দিন। ১-ম শিফটে নির্ধারিত সবক মুখস্থ শেষে অবশিষ্ট সময় মুরাজাআর জন্য ব্যয় করুন, এবং ৭-বছরে হিফয পূর্ণ করার দৃঢ় ইচ্ছা রাখুন, আল্লাহ তাওফিক দানকারী।

একবছরে যদিও ১২-মাস, কিন্তু একাডেমিক ক্যালেন্ডার হিসেবে আমরা শুধু ৭-মাসের হিসেব পেশ করেছি, অভিভাবকগণ অবশ্যই অবশিষ্ট ৫-মাসের যত্ন নিবেন, তাহলে আমাদের পরিকল্পনার অনেক আগে আপনার সন্তান হিফয সমাপ্ত করবে। দ্বিতীয়ত স্কুলের হিফয ধরে রাখার জন্য ছুটিতে অবশ্যই বাড়িতে তিলাওয়াত করা জরুরি। হিফয শেষ করে ছাত্র/ ছাত্রী অবশ্যই রীতিমত কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করবে, কখনো দেখে-কখনো মুখস্থ। বিশেষ করে দৈনন্দিন সালাতে তিলাওয়াত করার অভ্যাস গড়ে তুলবে। রীতিমত তিলাওয়াত না হলে মুখস্থ কুরআন অতিদ্রুত ভুলিয়ে দেওয়া হয়। তাই ছাত্র /ছাত্রী ও অভিভাবক সবাই হিফযের ন্যায় হিফয করা কুরআনের প্রতি যত্ন নিন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কোনো ছাত্র/ ছাত্রী যদি ধারাবাহিকতা রক্ষা করে হিফয বিভাগে রীতিমত পড়া-শুনা চালিয়ে যায়, তাহলে মেধা

ও অধ্যবসা অনুসারে ৫-৭ কিংবা ৮ বছরের মাথায় পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

হিফয বিভাগের উদ্দেশ্য:

হিফযের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আগ্রহকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, যাদের পূর্ণ কুরআনুল কারিম হিফয করার ইচ্ছা তাদের জন্য তার পরিকল্পনা রয়েছে। আর যেসব ছাত্র/ ছাত্রী হিফয শাখায় সংশ্লিষ্ট থেকে কুরআন সহি-শুদ্ধ পাঠ করা ও তার কম-বেশী অংশ হিফয করার ইচ্ছা পোষণ করে তাদের সে সুযোগ রয়েছে। তাই সবাইকে পূর্ণ কুরআন হিফয করানো হিফয বিভাগের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, বরং সবাই কম-বেশী কুরআনুল কারিম মুখস্থ করুক এটাই তার মূল লক্ষ্য।

হালাকায় বসে মুয়াল্লিমের করণীয়

খণ্ডকালীন হিফয শাখার প্রতিটি মুহূর্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মুয়াল্লিম প্রস্তুত থাকুন। দেখে নিন ছাত্রদের কুরআন, কায়দা, হাজিরা খাতা ও রিপোর্ট ফাইল যথাযথ আছে কি-না, রেহাল-টেবিল গোছানো ও ক্লাস-রুম পরিচ্ছন্ন কি-না। ক্লাস আরম্ভের শুরুতে ছাত্রদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি নিশ্চিত করুন। এবার সবার পড়ার দিকে মনোযোগ দিন, দেখে নিন কে-কি পড়ছে। প্রথমে কায়েদা গ্রুপের সবক বিশুদ্ধ করে দিন। অতঃপর নাজেরা গ্রুপের তিলাওয়াত বিশুদ্ধ করুন এবং ১০/১৫-বার পড়ে

তিলাওয়াত গতিশীল করে শুনাতে বলুন। কায়েদা ও নাজেরা গ্রুপের পড়া পর্যবেক্ষণ শেষে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী সময় বেঁধে দিন, যেন নির্ধারিত সময়ে তারা সবক শুনায়।

এবার হিফয গ্রুপের সবক শুনুন, তার পর কায়দা ও নাজেরা গ্রুপের সবক শুনুন। হিফযের ছাত্রদের সবক শেষে সম্ভব হলে তাদের পরবর্তী সবকের নাজেরা শুনে নিন এখনি, যেন পরবর্তী সবক তারা বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ করে শুনাতে সক্ষম হয়। এভাবে হিফযের ছাত্রদের সবক শেষে তাদের আগামী ক্লাসের পড়া শুদ্ধ করে দিন। ক্লাসে বসে যখন হিফযের ছাত্ররা হিফয করছে ও নাজেরার ছাত্ররা নাজেরা পড়ছে, তখন মুয়াল্লিম কায়দা পড়ুয়া কোনো ছাত্রকে ডেকে তার হরফ উচ্চারণ ও মাদ ঠিক করে দিন|

কম হোক বা বেশী হোক প্রতি ক্লাসে সবার থেকে সবক শুনুন, দু'দিনের সবক একসাথে শুনানো কিংবা মাঝে-সাজে সবক না শুনানোর বদ-অভ্যাস যেন কারো গড়ে না উঠে লক্ষ্য রাখুন। যার সবক শেষ তাকে পরবর্তী ক্লাসের পড়া পড়তে বলুন, যেন পরবর্তী ক্লাসে সবার আগে কিংবা মুয়াল্লিম বসার পর-মুহূর্তে সবক/মুরাজাআহ শুনাতে সক্ষম হয়| ছাত্রদের মাঝে আগে সবক দেওয়ার প্রতিযোগিতা গড়ে তুলুন। কখনো কারো সবক শ্রবণ করুন-কখনো কারো পড়া বিশুদ্ধ করে দিন এভাবে সারাটা সময় পার করুন। সব-সময় সতর্ক থাকুন ও সবার প্রতি দৃষ্টি রাখুন,

কারণ এক-জনের প্রতি বেশী মনোযোগ অন্যদের কথা-বার্তা ও দুষ্টুমিতে মগ্ন হওয়ার কারণ হতে পারে, তাই সর্বদা চোখ-কান খোলা ও সজাগ রাখুন। এক-সাথে একাধিক শিক্ষার্থীর সবক শ্রবণ করা দোষণীয়, তাই একান্ত ও বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত এ পদ্ধতি গ্রহণ না করাই শ্রেয়।

শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগী ও অধ্যবসায়ী করে গড়ে তোলার একটি পদ্ধতি হচ্ছে পরীক্ষা ও পুরষ্কারের ব্যবস্থা করা, তাই উপযুক্ত সময় ও নির্ঘণ্ট অনুসারে এ জাতীয় ব্যবস্থা রাখা জরুরি।

নির্দিষ্ট ফাইলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, নতুন হিফয ও মুরাজাআহ যথাযথ সংরক্ষণ করুন। অপর হালাকা থেকে আসা ছাত্রদের পড়ার মান, হিফযের পরিমাণ ও কিরূপ মুখস্থ আছে জেনে নিন। এ জন্য মান-যাচাই রিপোর্ট ব্যবহার করুন। চেষ্টা করুন নতুন ছাত্র/ ছাত্রী যেন মুরাজাআহ শুনানোর সাথে সামনের সবকও অব্যাহত রাখে, কারণ সবক বন্ধ করে পিছনের পড়া শুনাতে থাকলে তাদের মাঝে অলসতা চলে আসে।

সপ্তাহে এক বা একাধিকবার সম্মিলিতভাবে তাজবিদের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিন। সবক বন্ধ করে নয়, বরং যেদিন তাজবিদ নিয়ে আলোচনা করার প্রস্তুতি থাকে সেদিন অবশ্যই সবার থেকে ১৫/২০ মিনিট পূর্বে সবক শুনে নিন। অথবা যেদিন নির্দিষ্ট সময়ের আগে সবার সবক শেষ হয়, সেদিন তাজবিদ নিয়ে

আলোচনা করুন। সময়-সুযোগ বুঝে ছাত্র/ ছাত্রীদের ইসলামি আদব, দোয়া-আযকার শিক্ষা দিন ও গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় পরিভাষা ঠিক করুন।

ছুটির সময় মুয়াল্লিমের করণীয়:

হিফযের শিক্ষার্থীদের ছুটিসমূহ অধিক গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষভাবে যারা একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি হিফয পড়ে। মুয়াল্লিম ছুটির সময় তাদের উপদেশ দিন, যেন বাড়িতে বা বাসায় গিয়ে রীতিমত কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করে। অভিভাবকের উপর তাদের কুরআন তিলাওয়াত পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্ব সোপর্দ করুন। একটি চার্ট সাথে দিয়ে দিন, যেন তাতে প্রতিদিনের মুখস্থ তিলাওয়াত ও নাজেরা হিসাব রাখে। প্রয়োজন হলে সালাতে তিলাওয়াত করা সূরাসমূহের নাম লিপিবদ্ধ করার একটি কলাম রাখুন।

আবাসিক ছাত্রদের ক্ষেত্রে হোস্টেল সুপারের করণীয়:

১. হিফযের শিক্ষার্থীদের যথাসময়ে খাবার পরিবেশন করা।

২. হিফযের পূর্ববর্তী প্রোগ্রাম যথাসময়ে সমাপ্ত করা।

৩. হিফযের শিক্ষার্থীদের যথাসময়ে ঘুম পারানো।

৪. হোস্টেল সুপার, অন্যান্য মুয়াল্লিম ও অপর কর্তাব্যক্তিদের প্রতি কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নির্দেশ থাকবে, যেন সবাই হিফযের ছাত্রদেরকে যথাসময়ে ক্লাসে উপস্থিত থাকতে সাহায্য করে।

৫. আমাদের অভিজ্ঞক্ষতা বলে হিফযের জন্য ফ্লোরিং সিস্টেম, রেহেল বা টেবিল উপযুক্ত। অতএব একটি রুমকে হিফযের জন্য স্থায়ীভাবে হিফযের যাবতীয় উপকরণ দ্বারা সজ্জিত করুন, যেন পরিবেশ ছাত্র ও মুয়াল্লিমকে কুরআনুল কারিমের প্রতি মনোযোগী হতে সাহায্য করে এবং সবাই একাগ্র চিত্তে স্বীয় দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। উন্মুক্ত ফ্লোর, ক্লাসরুম ও করিডোরকে হিফযের ক্লাসরুম হিসেবে ব্যবহার করা ঠিক নয়।

৬. একজন মুয়াল্লিমকে ১০/১২ শিক্ষার্থীর অধিক দায়িত্ব না দেওয়া।

৭. কোনো শিক্ষার্থীর ব্যাপারে মুয়াল্লিম অভিযোগ করলে দ্রুত ব্যবস্থা নিন, বিশেষভাবে যদি তার দ্বারা অপর ছাত্র বা পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনাবাসিক শিক্ষার্থীর জন্য অভিভাবকদের করণীয়:

১. সন্তানদের যথাসময়ে ঘুম ও খাবারের প্রতি লক্ষ্য রাখুন।

২. নির্দিষ্ট সময়ে হিফযের হালাকায় পৌঁছে দিন।

৩. সন্তানের পড়া-শুনার ব্যাপারে সপ্তাহ কিংবা পনেরো দিন অন্তর মুয়াল্লিমের সঙ্গে আলোচনা করুন, রীতিমত সবক শোনায় কি-না জেনে নিন, প্রয়োজনে অবশ্যই রিপোর্ট ফাইল দেখুন এবং তার দৈনন্দিন উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখুন।

৪. একাডেমিক ক্যালেন্ডার হিসেবে স্কুলের কার্যদিবস হচ্ছে ২১৫দিন বা মাত্র সাত মাস। বাকি পাঁচটি মাস আপনার সন্তান আপনার কাছে থাকবে, অতএব আপনি তার হিফযের যত্ন নিন, বাড়িতে প্রতিদিন যেন কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করে। যদি পাঁচ পারা বা তার কম হিফয হয়, তাহলে বাড়িতে থাকাকালীন প্রতিদিন ৫-পৃষ্ঠা থেকে আধা পারা হিফয শুনুন। অভিভাবকগণ যত্নশীল না হলে ছাত্ররা হিফয ভুলে যাবে। লম্বা ছুটিতে সম্ভব হলে পার্শ্ববর্তী হিফযের হালাকা কিংবা বাসায় মুয়াল্লিম রেখে হিফয পড়ানোর ব্যবস্থা করুন, তাহলে উত্তরোত্তর উন্নতি করে ইনশাআল্লাহ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আপনার সন্তান হিফয সমাপ্ত করতে সক্ষম হবে।

কতক সমস্যা, সমাধান ও প্রস্তাব:

ক. লাইফ স্কুল পরিচালিত হিফয বিভাগের বর্তমান নির্ঘণ্ট সকল শিক্ষার্থীর জন্য যথাযথ উপযোগী নয়। এতে বেশ কিছু সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, বিশেষভাবে একাডেমিক পড়া-শুনা শেষে দুপুর শিফটে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা কঠিন হয়, গরমের মৌসুমে এ সমস্যা বেশী হয়। ছোট রাত, প্রচণ্ড গরম ও লম্বা দিনের কারণে অনেকের শরীর তখন ক্লান্ত থাকে। শীতের মৌসুমে সময় স্বল্পতার কারণে অন্য সমস্যা দেখা দেয়, বিশেষভাবে এক-ঘণ্টা হিফযের মধ্যবর্তী সময় আসরের সালাত

আদায় করা মনোযোগের ক্ষেত্রে বড় বাঁধা হয়। উল্লেখ্য, আমাদের স্কুলে আসরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে পড়া হয়। অতএব দুপুর শিফট বন্ধ করে সকাল ও রাতের শিফটের সময় সামান্য বাড়িয়ে তাতেই যথেষ্ট করা যায়, তখন এক শিফটে পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা সকাল শিফটে অংশ গ্রহণ করবে।

খ. এক-ঘণ্টা সময় নিয়ে হিফযের হালাকায় বসা যথেষ্ট নয়, এতে প্রচুর সময় নষ্ট হয়, তাই সুবিধামত সময়ে একসাথে দুই বা আড়াই ঘণ্টার হালাকা উত্তম মনে হয়; যেমন সকাল বেলা এক-সাথে দু'ঘণ্টা অথবা আসরের পর একসাথে দু'ঘণ্টা অথবা মাগরিবের পর একসাথে দু'ঘণ্টা হিফযের হালাকা চালু করা যায়। সৌদি আরবের অনেক মসজিদে আসর সালাতের পর হিফযের একাধিক হালাকা আরম্ভ হয়।

গ. 'লাইফ স্কুল' কর্তৃক পরিচালিত হিফয বিভাগের নির্ঘণ্ট ডা. জাকের নায়ক পরিচালিত হিফয বিভাগ থেকে সংগৃহীত। ডা. জাকের নায়েক ছাত্রদের পড়া-শুনার পুরো সময় তথা পূর্ণদিন তিনি নিয়ে নেন। অতঃপর তিনি সময় ভাগ করে তাতে ছাত্রদের পরিচালনা করেন, যেখানে হিফয করার রুটিনও থাকে। লাইফ স্কুল যদি তাদের পূর্ণ অনুকরণ করে খুব ভালো, তখন দুপুরে খাবার-দাবার শেষে ১:৩০মি. বা ২:০০ ঘণ্টা বিশ্রামের পর যে কোনো রুটিন অনুসরণ করা শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো সমস্যা

নয়। বর্তমান নির্ঘণ্ট মোতাবেক দুপুর শিফটের শিক্ষার্থীরা একাডেমিক পড়া-শুনা শেষে বিশ্রাম নেওয়ার কোনো সময় পায় না, তাই এ সময় হিফযের হালাকা অনেকের জন্য কষ্টকর হয়।

হিফয বিভাগের জবাবদিহিতা

সময়ের সদ্ব্যবহার করা হিফয-শাখার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হিফয শাখা যদি হয় খণ্ডকালীন, তাহলে তার গুরুত্ব আরো অধিক। অতএব মুয়াল্লিম ছাত্র/ ছাত্রীর প্রতি মুহূর্তের যত্ন নিন। লক্ষ্য রাখুন প্রতি ক্লাসে যেন তার কম-বেশী উন্নতি হয়। মুয়াল্লিম প্রমাণ করবেন প্রত্যেক ছাত্র/ ছাত্রী দিনদিন উন্নতি করছে, কেউ পিছিয়ে পড়ছে না, কিংবা কেউ থেমে থাকছে না। এ জন্য মুয়াল্লিমকে ছাত্র/ ছাত্রীর উপস্থিতি-অনুপস্থিতি, নতুন হিফয ও পিছনের মুরাজাআহ সংরক্ষণ করতে হবে, তাহলে হিফয বিভাগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। এ কাজগুলো বিভিন্ন রিপোর্টের মাধ্যমে করা হলে সুসংহত ও পরিপক্ক হয়। হিফয বিভাগের জবাবদিহিতার স্বার্থে নমুনা স্বরূপ এখানে আমরা চারটি রিপোর্ট ও তার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করছি: ১. মান-যাচাই রিপোর্ট; ২. পাক্ষিক রিপোর্ট; ৩. মাসিক রিপোর্ট; ও ৪. বাৎসরিক রিপোর্ট।

১. মান যাচাই রিপোর্ট:

একজন ছাত্র/ ছাত্রী যখন হিফয বিভাগে ভর্তি হয়, এ রিপোর্টের মাধ্যমে আরবি হরফ কিংবা কুরআনুল কারিমের উপর তার দক্ষতা যাচাই করা হয়। যদি এ হালাকা থেকে শিক্ষার্থীর কুরআন শিক্ষার সূচনা হয়, তাহলে আরবির উপর ইতঃপূর্বে সে যে পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করুক তা লিপিবদ্ধ করা হয় এতে। মুয়াল্লিম তার অক্ষর জ্ঞান, হরফের শুদ্ধাশুদ্ধ উচ্চারণ জেনে নিন ও তার রেকর্ড রাখুন, অতঃপর তার মুখস্থ সূরার শুদ্ধাশুদ্ধ জেনে নিন ও তার রেকর্ড রাখুন। নাজেরা হলে কতটুকু অংশ বিশুদ্ধ ও সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করতে সক্ষম তার তথ্য সংগ্রহ করুন। অপর হালাকা থেকে আসলে শিক্ষার্থীর হিফযের পরিমাণ, বিশুদ্ধতার মান ও মুরাজাআর অবস্থা সংরক্ষণ করুন। আমরা নমুনা স্বরূপ একটি মান-যাচাই রিপোর্ট নিম্নে পেশ করছি:

استمارة مستوى الطالب/ة في الحفظ والتجويد

اسم الطالب/ة: تحية حسن عبد الله　　　مقدار الحفظ : من سورة الكافرون إلى سورة الناس الصف: الأول

اسماء السور	الحفظ		التجويد		ممتحن	تاريخ الامتحان	الملاحظة
	أتقن	لم يتقن	أتقن	لم يتقن			
ي و ش خ ن							
ض ك ب ذ ع ف							
د أ ل ط ه غ							
ح ص م ظ ق							

ث زت ر ج س							
الفاتحة							
الناس							
الفلق							
الإخلاص							
اللهب/المسد							
النصر							
الكافرون							

تاريخ انتهاء اختبار مستوى الطالب　　　　توقيع المشرف

এ রিপোর্টে হিফযের পরিমাণ তথা কয়টি সূরা মুখস্থ, কয়টি সূরার হিফয দুর্বল, কয়টি সূরার তিলাওয়াত শুদ্ধ বা অশুদ্ধ ইত্যাদি তথ্য লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। রিপোর্টের শুরুতে দেখুন اسم الطالب তার বাঁপাশে ডট চিহ্নের জায়গায় ছাত্র/ ছাত্রীর নাম লিখুন, অতঃপর দেখুন مقدار الحفظ তার বাঁপাশে হিফযের পরিমাণ লিখুন, যেমন সূরা বালাদ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত, আর যদি কায়েদা গ্রুপের হয়, তাহলে মুবতাদি বা কায়েদা লিখুন।

অতঃপর আরো বাঁপাশে দেখুন الصف। তার বাঁপাশে ক্লাসের নাম বা ভর্তির তারিখ লিখুন।

এবার টেবিলের কলামসমূহে নজর দিন। কলাম-১. اسماء السور শিক্ষার্থী যদি কায়েদা গ্রুপের হয়, প্রথম কলামে উক্ত শিরোনামের নিচে আরবি হরফসমূহ লিখুন। কোনো রোতে তিনটি কোনো রোতে পাঁচটি হরফ লিখুন। যে কয়টি রো প্রয়োজন হয় ব্যবহার করুন এবং সব ক'টি হরফ তাতে সাজিয়ে লিখুন। অতঃপর তার নিচের রোতে শিক্ষার্থীর মুখস্থ সূরাসমূহের নাম লিখুন।

কলাম-২. الحفظ। এ কলামের অধীন দু'টি কলাম রয়েছে: ক. أتقن অর্থ হিফয দৃঢ় বা মজবুত। খ. لم يتقن অর্থ হিফয দৃঢ় নয় কিংবা দুর্বল। ক ও খ উভয় কলামে হিফয সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করুন। উদাহরণত ১-নং কলামে বিদ্যমান যেসব হরফের পরিচয় শিক্ষার্থী দৃঢ়ভাবে জানে, কিংবা ১-কলামের যেসব সূরা শিক্ষার্থীর দৃঢ়ভাবে মুখস্থ রয়েছে أتقن বরাবর ঠিক চিহ্ন ব্যবহার করুন। আবার ১-নং কলামের যেসব হরফ শিক্ষার্থী দৃঢ়ভাবে জানে না, কিংবা ১-কলামের যেসব সূরা শিক্ষার্থীর দৃঢ়ভাবে মুখস্থ নয় لم يتقن বরাবর টিক চিহ্ন ব্যবহার করুন।

কলাম-৩. التجويد এর অধীন পূর্ববৎ দু'টি কলাম ক. أتقن অর্থ ১-নং কলামের হরফ বা সূরার উচ্চারণ বিশুদ্ধ, অতএব এতে টিক

চিহ্ন দিন। খ. لم يتقن অর্থ ১-নং কলামের হরফ বা সূরার উচ্চারণ বিশুদ্ধ নয়, অতএব এতে টিক চিহ্ন দিন। ক ও খ উভয় কলামে তাজবিদ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করুন।

কলাম-৪. متحن অর্থ পরীক্ষক। এখানে পরীক্ষক স্বীয় নাম লিখুন বা স্বাক্ষর দিন। কলাম-৫. تاريخ الامتحان অর্থ পরীক্ষা গ্রহণ করার তারিখ। ১-নং কলামের হরফ বা সূরাসমূহ পরীক্ষক কোন কোন দিন শ্রবণ করছেন এতে তার তারিখ লিখুন। ১-নং কলামের সবক'টি সূরা/ হরফের পরীক্ষা একদিন গ্রহণ করা সম্ভব না হলে, একাধিক দিনে গ্রহণ করুন ও তার তারিখ লিখুন এবং যথারীতি সবক চলমান রাখুন। কলাম-৬. الملاحظة অর্থ মন্তব্য। কোনো মন্তব্য থাকলে পরীক্ষক এতে তা লিখে দিন। রিপোর্টের নীচে মুয়াল্লিম/ মুশরিফের মন্তব্য, স্বাক্ষর ও তারিখ।

এ রিপোর্ট দ্বারা ছাত্র/ ছাত্রীর সবলতা বা দুর্বলতা চিহ্নিত হয়। ছাত্র/ ছাত্রী সবল প্রমাণিত হলে তাকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হোন, আর দুর্বল প্রমাণিত হলে তার দুর্বলতাসমূহ দূর করুন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে। তবে সবক বন্ধ করে নয়, প্রয়োজন হলে সবকের পরিমাণ কমিয়ে দিন এবং রীতিমত পিছনের পড়া শ্রবণ করুন। সবক বন্ধ করে পিছনের পড়া শুনার ফলে অনেকের মাঝে অলসতা ভর করে। সপ্তাহ, দুই-সপ্তাহ বা তিন-সপ্তাহ অন্তর অন্তর মুশরিফ বা দায়িত্বশীল দুর্বল সূরাগুলোর উন্নতি পর্যবেক্ষণ করুন

ও হাফিয সাহেবকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন। কিংবা খোদ হাফিয সাহেব স্বীয় ছাত্রকে তদারকি করুন।

এ রিপোর্ট দ্বারা ভর্তি পরবর্তী ছাত্র/ ছাত্রীর পড়া-শুনার জরুরি তথ্য সংগ্রহ করা খুব সহজ, পরবর্তীতে যার খুব প্রয়োজন হয়, বিশেষভাবে খণ্ডকালীন হিফয বিভাগসমূহে। এ রিপোর্ট দ্বারা দ্বিতীয় আরেকটি কাজ করা যায়, যেমন প্রতি চার/ ছয় মাস পর ছাত্র/ ছাত্রী সম্পর্কে এসব তথ্য সংগ্রহ করে পরীক্ষার ন্যায় তাদের পুরনো হিফয পর্যবেক্ষণে রাখা যায়; তবে এসব তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পৃথক প্রস্তুতি-ঘোষণা ও ছুটির প্রয়োজন নেই। মুরাজাআহ শ্রবণ করার ন্যায় ছাত্র/ ছাত্রী থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করুন। মুশরিফ বা জিম্মাদার কয়েকমাস পরপর ছাত্র/ ছাত্রীদের মান যাচাই করতে থাকবেন।

ভর্তি পরবর্তী এ পরীক্ষা বা মান-যাচাই মুয়াল্লিম কিংবা হাফেয সাহেব করবেন, একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত দ্বিতীয় কাউকে ব্যবহার না করা ভালো। পরবর্তীতে পুনরায় এ পরীক্ষার প্রয়োজন হলে হাফেয সাহেবের পরিবর্তে মুশরিফ নিবেন, কিংবা কাউকে নিতে বলবেন, একান্ত ও অগত্যা কোনো কারণ ব্যতীত মুয়াল্লিমকে তখন এ পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট না করাই ভালো।

২. পাক্ষিক রিপোর্ট:[1]

পাক্ষিক রিপোর্ট মূলত মৌলিক রিপোর্ট। সবক শেষে ছাত্র/ ছাত্রী নিজেরা বা শিক্ষক এ রিপোর্ট পূরণ করবেন। এতে প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালীন উভয় শিফটের পড়া-শুনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সবিস্তারে লিপিবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। এ রিপোর্টের শুরুতে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যেমন ছাত্র/ ছাত্রীর নাম, ক্লাস, মোবাইল নাম্বার, হিফয-নাজেরা-মুবতাদি, ইতিপূর্বের মুখস্থ বা নাজেরার পরিমাণ, রিপোর্ট শুরু ও শেষের তারিখ এবং হিফয শাখায় ভর্তি হওয়ার তারিখ। প্রয়োজন হলে তথ্য সংগ্রহ করার কতক অপশন বাড়ানো কিংবা প্রয়োজন না হলে কিছু অপশন কমানো সমস্যা নয়।

টেবিলের প্রথম রো দেখুন প্রাতঃকালীন হালাকা ও সান্ধ্যকালীন হালাকা দু'ভাগে বিভক্ত। অতঃপর প্রাতঃকালীন শিফটে ৭-টি কলাম রয়েছে: কলাম-১. الأيام দিনের নাম, এতে সপ্তাহের ৬-

---

[1] বর্তমান আমি লাইফ স্কুলের হিফজ শাখার জিম্মাদার। এতে ১-ঘণ্টা করে দু'ঘণ্টা দু'শিফট হিফযের ক্লাস হয়: প্রথম শিফট সকাল ৬:৫০-৭:৫০পর্যন্ত। এতে আবাসিবক-অনাবাসিক সকল ছাত্র অংশ গ্রহণ করে। অনাবাসিক ছাত্রদের জন্য দ্বিতীয় শিফট: বিকাল ২:৫০-৩:৫০ পর্যন্ত এবং হোস্টেলের ছাত্রদের জন্য দ্বিতীয় শিফট রাত ৮:০০-৯:০০ পর্যন্ত| এ হিসেবে পাক্ষিক রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে, তবে তার উপর ভিত্তি করে যে কোনো হিফয শাখার রিপোর্ট তৈরি করা সহজ, কারণ সকল হিফয খানার পড়া-শুনার পদ্ধতি প্রায় এক, পার্থক্য শুধু রুটিনে।

দিনের মান রয়েছে। কলাম-২. حضور উপস্থিতি, এতে শিক্ষার্থীর উপস্থিতর সময় লিপিবদ্ধ করা হয়। কলাম-৩. / حفظ / مراجعة قاعدة হিফয/ মুরাজাআহ/ কায়েদাহ, শিক্ষার্থী যদি হিফয শুনায়, এখানে হা বা হিফয লিখবে। শিক্ষার্থী মুরাজাআহ শোনালে এখানে মীম বা মুরাজাআহ লিখবে। আর শিক্ষার্থী কায়েদা গ্রুপের হলে কায়েদা লিখবে। কলাম-৪. اسم السورة সূরার নাম, হিফয বা নাজেরা গ্রুপের শিক্ষার্থী হলে এখানে সূরার নাম লিখবে। কায়েদা গ্রুপের শিক্ষার্থী হলে এখানে পৃষ্ঠা সংখ্যা লিখবে। কলাম-৫. শিক্ষার্থী হিফয বা নাজেরা গ্রুপের হলে এখানে আয়াত সংখ্যা লিখবে। আর শিক্ষার্থী কায়েদা গ্রুপের হলে এখানে লাইন সংখ্যা লিখবে। কলাম-৬. ملاحظة মন্তব্য, কোনো শিক্ষার্থীর সবক খুব সুন্দর হলে মুমতাজ, অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলে জায়্যিদ জিদ্দান, অপেক্ষাকৃত আরো দুর্বল হলে শুধু জায়্যেদ লিখবেন। আর মুখস্থ বা বিশুদ্ধ না হলে দায়িফ লিখবেন, যার অর্থ এ সবক পুনরায় শুনাতে হবে। এ রিপোর্ট ছাত্র/ ছাত্রী, অভিভাবক ও মুয়াল্লিম সবার জন্য সুবিধাজনক। দ্বিতীয়ত পরবর্তী ক্লাসে কোনো কারণে নির্ধারিত মুয়াল্লিম অনুপস্থিত থাকলে যিনি উপস্থিত থাকবেন, তিনি রিপোর্ট দেখে বুঝবেন শিক্ষার্থীর করণীয় কী।

মন্তব্যের জায়গায় শিক্ষক মহোদয় উপস্থিতি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করুন, যেমন কেউ হালাকায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও

অসুস্থতার কারণে সবক শুনাতে পারেনি, তাহলে মারিদ বা অসুস্থ লিখুন, মনোযোগী না হলে সংক্ষেপে তার তথ্য সংগ্রহ করুন। অনুপস্থিত হলে গায়েব বা অনুপস্থিত লিখুন। অনুরূপ তথ্য বিকাল শিফটে সংগ্রহ করুন।

এ রিপোর্ট সাপ্তাহিক হতে পারে, তবে কাগজের অপচয় রোধ ও পূর্ণপৃষ্ঠা ব্যবহারের স্বার্থে পাক্ষিক বেছে নিয়েছি; আবার এক পৃষ্ঠায় চারসপ্তাহ বা পুরোমাসের এসব তথ্য স্পষ্টাক্ষরে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, তাই মাসিক গ্রহণ করিনি। পক্ষশেষে ১৫দিনের মোট হিফয ও মুরাজাআহ সংগ্রহ করুন। অতঃপর মুয়াল্লিম তারিখসহ নিচে ডান পাশে স্বাক্ষর করুন। মুশরিফ বা দায়িত্বশীল পূর্ণ রিপোর্ট দেখে সংশোধনী বা মন্তব্য লিখে নিচে বাঁপাশে তারিখসহ স্বাক্ষর করুন। রিপোর্টের নমুনা নিম্নরূপ:

حلقة تحفيظ القرآن الكريم

لايف اسكول، أترا، داكا

<u>تقرير النصف الشهر للحلقة</u>

اسم الطالب ثنائيا:عبد الله بن عبد الخالق الصف: الصف الأول قسم التحفيظ / الناظرة / النورانية

مقدار القراءة نظرا / الحفظ من قبل: من سورة الناس إلى الهمزة بداية النصف الأول / الثاني: ١٤/ ٠٧ /.٢٠١٣م تاريخ الالتحاق: ٢٠١٣/٠٧/٠١م

الحلقة الصباحية							الحلقة المسائية				
الأيام	حضور	حفظ / مراجعة	اسم السورة	آيات من = إلى	ملاحظة	أوقات الدروس والصلاة	حضور	حفظ / مراجعة	اسم السورة	آيات من = إلى	ملاحظة
يوم الأحد	٧:٥٠	حفظ جديد	العصر	كاملا	ممتاز						غائب
يوم الاثنين	٨:١٠	حفظ جديد	التكاثر	١-٤	جيد		٢:٥٠	مراجعة	الهمزة	كاملا	جيد جدا

يوم الثلاثاء					مريض						غائب
يوم الأربعاء	٨:٢٠	حفظ جديد	التكاثر	٨-٥	ضعيف		٢:٥٠	مراجعة	التكاثر	كاملا	جيد
يوم الخميس					غائب						غائب
أيام الإجازة : يوم الجمعة ويوم السبت											
يوم الأحد	٧:٥٠	حفظ	القارعة	٤-١	جيد		٢:٥٠	مراجعة	العصر	كاملا	ممتاز
يوم الاثنين	٧:٥٠	حفظ	//	٨-٥	جيد	أوقات الدروس	٢:٥٠	مراجعة	الفيل	كاملا	ممتاز
يوم الثلاثاء					غائب						غائب
يوم الأربعاء					غائب						غائب
يوم الخميس	٧:٥٠	حفظ	القارعة	١١-٩	جيد		٢:٥٠	مراجعة	القارعة	كاملا	جيد

مقدار الحفظ في هذا النصف من الشهر:

سورة العصر، التكاثر والقارعة

توقيع معلم الحلقة

...

مقدار المراجعة في هذا النصف من الشهر:

الهمزة، التكاثر، العصر، الفيل والقارعة.

توقيع مشرف الحلقة

...

৩. মাসিক রিপোর্ট:

এ রিপোর্ট দ্বারা একসাথে ১০-১৫ জন ছাত্র/ ছাত্রীর মাসিক হিফয ও মুরাজাআহ সংরক্ষণ করা হয়। রিপোর্টের শুরুতে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য যেমন: اسم الشهر الشمسي সৌর-মাসের নাম, السنة ইংরেজি বছর, عدد أيام الدراسة এ মাসে কতদিন ক্লাস হয়েছে, বা

কার্যদিবস। দ্বিতীয় লাইনে عدد الطلاب والطالبات ছাত্র/ ছাত্রী সংখ্যা, الشهري الهجري হিজরি মাস ও السنة الهجرية হিজরি বছর। অতঃপর টেবিল দেখুন: কলাম-১. ক্রমিক নং, এ কলামে শিক্ষার্থীদের ক্রমিক নাম্বার লিখুন। কলাম-২. এ কলামে ছাত্র/ ছাত্রীদের নাম লিখুন। কলাম-৩. এখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থী স্বস্ব ক্লাসের নাম লিখুন। কলাম-৪. এখানে শিক্ষার্থীর গ্রুপের নাম লিখুন, যেমন হিফয/ নাজেরা/ কায়েদাহ ইত্যাদি। কলাম-৫. এ কলামে অত্র মাসে হিফযের পরিমাণ লিখুন। কলাম-৬. এ কলামে অত্র মাসে মুরাজাআর পরিমাণ লিখুন। কলাম-৭. এ কলামে অত্র মাসে সকাল-বিকাল ও মোট উপস্থিতির পরিমাণ লিখুন। কলাম-৮. মন্তব্য লিখুন। নিম্নে মাসিক রিপোর্টের নমুনা পেশ করা হল:

حلقة تحفيظ القرآن الكريم

التقرير الشهري للحلقة

اسم الشهر الشمسي:......................السنة: ....م عدد أيام الدراسة: ....

عدد الطلاب والطالبات: .... الشهري الهجري:...........................السنة الهجرية:............

رقم	أسماء الطلاب /الطالبات	الصف	نوع القراءة	مقدار الحفظ / القراءة بصرية / النورانية	مقدار المراجعة	نوع الحضور مع العدد			الملاحظة
						صباحا	مساء	عدد	
١									
٢									
٣									

									٤
									٥
									٦
									٧
									٨
									٩
									١٠
									١١
									١٢
									١٣
									١٤
									١٥

مقدار الحفظ في هذا النصف من الشهر:

توقيع معلم الحلقة والملاحظة إن كانت

... ...

مقدار المراجعة في هذا النصف من الشهر:

توقيع مشرف الحلقة مع الملاحظة

... ...

আমরা পূর্বে জেনেছি যে, কুরআনুল কারিম শুধু মুখস্থ করলে হবে না, বারবার পড়ে তার চর্চা রাখতে হবে, অন্যথায় উটের চেয়েও

দ্রুতবেগে বিদায় নিবে সে। তাই আমরা নতুন হিফযের পাশাপাশি পুনরায় শুনানোর প্রতি সমান গুরুত্ব প্রদান করি। মুখস্থ অংশ পুনরায় পড়াকে আরবিতে মুরাজাআহ বলা হয়, রমদান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীল আমীনের সাথে মুরাজাআহ করতেন।[1]

৪. বাৎসরিক রিপোর্ট:

মাসিক রিপোর্ট সামান্য পরিবর্তন করে বাৎসরিক রিপোর্ট তৈরি করা যায়, শুরুতে নির্দিষ্ট ছাত্র/ ছাত্রীর নাম লিখে ক্রমিক নাম্বারের জায়গায় বারোটি মাসের নাম ও তার পাশাপাশি প্রত্যেক মাসের বিস্তারিত রিপোর্ট লিখা হলে বাৎসরিক রিপোর্ট হয়। আবার নিম্নের রিপোর্টও ব্যবহার করা যায়। এতে হিফযের দিন-তারিখ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা রয়েছে:

---

[1] বুখারি: (৬)

الأيام / الشهور	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
يوليو		الماعون وقريش							الفيل والهمزة														إجازة رمضان								
أغسطس								إجازة رمضان و عيد الفطر												العصر والتكاثر							القارعة والعاديات 1-6				
سبتمبر			العاديات 7-11							الزلزال							البينة 1-6							البينة 7-8 والقدر					العلق 1-5		00
أكتوبر		العلق 7-11					العلق 12-19								عيد الأضحى							التين 1-8							الانشراح		
نوفمبر					الضحى كاملا							الليل 1-11							الليل 12-21							الشمس كاملا					00
ديسمبر			البلد 1-11							البلد 12- كاملا							الاستعداد للاختبار									الاختبار					
يناير																					الفجر 1-15							الفجر 16- كاملا			
فبراير				الغاشية كاملا							الأعلى كاملا							الطارق كاملا							البروج 1-10					00	
مارس				البروج 11- كاملا							الانشقاق 1-12							الانشقاق 13- كاملا							المطففين 1-17						المطففين
أبريل		المطففين كاملا						الانفطار كاملا							التكوير كاملا							عبس كاملا							النازعات 1-25		00
مايو						النازعات 26- كاملا							الملك 1-22							النبأ 23- كاملا							الملك 1-10				
يونيو			الملك 11-22							الملك 23- كاملا							الاستعداد للاختبار									الاختبار					00

চারটি রিপোর্ট একসাথে একটি খাতার রূপ দেওয়া যায়, তাহলে সবার জন্যই সংরক্ষণ করা সহজ। হিফয বিভাগের জবাবদিহিতার স্বার্থে চারটি রিপোর্টের মাধ্যমে নতুন হিফয ও মুরাজাআর রেকর্ড সংরক্ষণ করা জরুরি। এতে ছাত্র/ ছাত্রীগণ নিজেদের পড়া-শুনার প্রতি যত্নশীল হয়, শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়, অভিভাবকগণ পরিতৃপ্ত হন এবং ছাত্র/ ছাত্রীরাও দিনদিন উন্নতি করতে শিখে। অধিকন্তু রিপোর্টের কারণে ছাত্র/ ছাত্রীরা নিজেদের দুর্বলতা চিহ্নিত করে সহজে তা শোধরে নিতে সক্ষম হয়।

ছাত্র/ ছাত্রী ক্লাসে প্রবেশ করার সময় পাক্ষিক রিপোর্টে উপস্থিতির সময় লিখে তাদের হাতে রিপোর্ট ফাইল প্রদান করুন। আবার সবক শেষে বিস্তারিত লিখে রিপোর্ট ফাইল সংরক্ষণ করুন। বাহ্যত এ কাজগুলো ঝামেলার ও সময় সাপেক্ষ মনে হয়, কিন্তু

বাস্তবে এরূপ নয়, দায়িত্বশীল মুয়াল্লিম এসব রিপোর্ট সংরক্ষণ করে তৃপ্তি বোধ করেন, নিয়মিত রিপোর্ট লিখলে সময় নষ্ট হয় না। একজনের জন্য ১০ সেকেন্ড সময় গড় ব্যয় হবে। কিছু তথ্য ছাত্র/ ছাত্রী নিজেরা পূর্ণ করতে সক্ষম।

সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম

কুরআনুল কারিম শুধু তিলাওয়াত করা নয়, তাতে সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত জরুরি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۝٤ ﴾ [المزمل: ٤]

"আর কুরআনকে তারতীলসহ তিলাওয়াত কর"।[1] তারতীল অর্থ তাজবিদসহ তিলাওয়াত করা, অর্থাৎ মাদ, গুন্নাহ, মাখরাজ ও সিফাতসহ প্রত্যেক হরফ উচ্চারণ করা। আমরা পূর্বে জেনেছি যে, আল্লাহ সুন্দর তিলাওয়াত যেভাবে শ্রবণ করেন কোনো বস্তু সেভাবে শ্রবণ করেন না। অধিকতর বিশুদ্ধ ও সুন্দর তিলাওয়াতের জন্য সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম খুব জরুরি। এতে বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত কারী ও হাফেযদের পঠিত কিরাত ও হদর অডিও, ভিডিও এর মাধ্যমে শোনানো ও দেখানো, প্রয়োজনে সরবরাহ করা| এভাবে ছাত্র/ ছাত্রীরা বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয় এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের পছন্দনীয় তিলাওয়াত বেছে নিতে

[1] সূরা মুজ্জাম্মিল: (৪)

সক্ষম হয়। প্রয়োজন হলে কোনো কারী কিংবা ভালো পাঠদানে সক্ষম কোনো হাফিয সাহেবকে সাপ্তাহিক প্রোগ্রামে দাওয়াত দেওয়া। এভাবে একটি হিফয বিভাগ সুন্দর, প্রাণবন্ত ও প্রাচুর্যময় হয়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ।

শিক্ষকদের প্রতি পরিচালকদের দায়িত্ব

কুরআনুল কারিমের হাফিয আল্লাহর কালামের ধারক। তারা সর্বশ্রেষ্ঠ, সম্মানিত ও আল্লাহর মনোনীত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ ثُمَّ أَوۡرَثۡنَا ٱلۡكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِنَاۖ ۝٣٢ ﴾ [فاطر: ٣٢]

"অতঃপর আমি এ কিতাবটির উত্তরাধিকারী করেছি আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে, যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি"।[1] নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«خيركم من تعلم القرآن وعلمه».

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়"।[2] কুরআনুল কারিমের প্রতি মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব অনেক, তার বিধান বাস্তবায়ন করা, তাকে ন্যায় ও ইনসাফের মানদণ্ড স্থির করা, তার সূরাসমূহ হিফয ও তিলাওয়াত করা, তার ব্যাখ্যা ও তাফসীর করা, তাতে চিন্তা ও গবেষণা করা ইত্যাদি। মুসলিম

---

[1] সূরা ফাতির: (৩২)

[2] বুখারি: (৫০২৭)

উম্মার পক্ষ থেকে হাফিযগণ দু'টি দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছেন: কুরআনুল কারিম মুখস্থ করা ও তার তিলাওয়াত করা। এটা যেরূপ তাদের জন্য সৌভাগ্য, অনুরূপ মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাদের বড় দান। মুসলিম যদি তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বৃদ্ধি করে, তারাও তাদের সঙ্গী হবে, তারাও অবদান রাখবে কুরআনুল কারিম সংরক্ষণের ক্ষেত্রে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا».

"যে কোনো গাজিকে আল্লাহর রাস্তায় অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে প্রস্তুত করে দিল সেও যুদ্ধ করল, আর যে কোনো গাজীর প্রতিনিধিত্ব[1] করল কল্যাণের সাথে সেও যুদ্ধ করল"।[2]

আমাদের সমাজে হাফিযগণ অবহেলার পাত্র, তাদের সরকারী সনদ নেই ও ভাতা নেই। তারা রাষ্ট্রীয় অধিকার ও নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত। কতক উৎসব ও অনুষ্ঠান ব্যতীত আমাদের সমাজ তাদের প্রয়োজন বোধ করে না। হাফিযদের প্রতি এ অবজ্ঞা অবশ্যই কুরআনুল কারিমের প্রতি অবজ্ঞার শামিল! কুরআনের

---

[1] আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধকারী গাজির পরিবার দেখা-শুনা ও তাদের প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করা।

[2] বুখারি: (২৮৪৩), মুসলিম: (১৮৯৬)

ধারকদের সম্মান যেখানে ভূলুণ্ঠিত, তারা অবহেলা ও অসম্মানের পাত্র, সেখানে আমরা কিভাবে আল্লাহর করুণা দ্বারা ধন্য হব।

হিফয সমাপ্ত করে হাফিযগণ যখন পার্থিব প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ দেয়, তখন তাদের সামনে পুরো দুনিয়া থাকে অন্ধকার। মসজিদের ইমামত, মুয়াজ্জিন বা খাদেম হওয়া ব্যতীত জীবিকা নির্বাহের কোনো পথ থাকে না, তাই দিনদিন মানুষ কুরআন থেকে বিমুখ হচ্ছে। মুসলিমরা হাফিযদের হক ভুলে বসছে, অথচ মর্যাদার মাপকাঠি ছিল এক সময় কুরআন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার খলিফাগণ হাফিযদের নেতৃত্ব ও সম্মানের আসন প্রদান করেছেন, যদিও তারা বয়সে ছোট ছিল।

অতএব নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হিসেবে মাদ্রাসার পরিচালকগণ কুরআনের মুয়াল্লিমকে উপযুক্ত ভাতা প্রদান করুন, তার পরিবার ও অর্থনৈতিক অবস্থার খোজ রাখুন ও তাতে অংশ গ্রহণ করুন। কারণ হাফিযগণ ও পরিচালকবৃন্দ পরস্পর সহযোগী, আল্লাহ সহযোগিতার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ ۝٢ ﴾ [المائدة: ٢]

“তোমরা তাকওয়া ও কল্যাণের ক্ষেত্রে একে অপরকে সাহায্য কর”।[1]

এ সহযোগিতা তাদের উপর করুণা নয়, বরং মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব সম্পর্কে অবশ্যই আমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। আল্লাহ কুরআনুল কারিমকে হিফাজত করবেন, আমরা যদি তার সংরক্ষণে এগিয়ে না আসি অবশ্যই তিনি এমন এক জাতি তৈরি করবেন, যারা কুরআনকে হিফাজত করবে এবং তারা আমাদের মত হবে না, তিনি বলেন:

﴿وَإِن تَتَوَلَّوۡاْ يَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمۡثَٰلَكُم٣٨﴾ [محمد : ٣٨]

“যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের ছাড়া অন্য কোনো কওমকে স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারপর তারা তোমাদের অনুরূপ হবে না”।[2]

হিফযের অধিকাংশ হালাকায় মুয়াল্লিমদের যথাযথ সম্মানী দেওয়া হয় না, তাতে পড়া-শোনার মানোন্নয়ন না হওয়ার জন্য এটাও কম দায়ী নয়। অতএব যেসব হালাকায় হাফেযদের ভালো বেতন প্রদান করা হয়, পরিচালক হিসেবে আপনারা তাকে আদর্শ জ্ঞান করুন, কিংবা আপনারা এ ময়দানে পথিকৃৎ হোন, বরং কুরআনুল কারিমের মুয়াল্লিমদের অধিক বেতন প্রদান করা গর্ব ও গৌরবের

---

[1] সূরা মায়েদাহ: (২)

[2] সূরা মুহাম্মদ: (৩৮)

বস্তু হিসেবে নিন। একজন শিক্ষক থেকে দু'জন শিক্ষকের খিদমত নেওয়া হলে অবশ্যই তাকে সমপরিমাণ ভাতা প্রদান করুন। ব্যস্ততা বৃদ্ধির কারণে ত্রুটি হলে সুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন, তাকে উৎসাহ দিন ও তার শ্রমের প্রশংসা করুন। আল্লাহ আমাদেরকে তার কুরআনের খিদমত করার সুযোগ প্রদান করুন।

শিক্ষার্থীদের প্রহার করার বিধান

ইসলামের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা গোটা দুনিয়ার রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন, তাই ইসলাম দয়া, অনুগ্রহ, রহমত ও কল্যাণ কামনার দীন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧ ﴾ [الانبياء: ١٠٧]

"আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি"।[1] বিশেষভাবে দুর্বলদের উপর রহম করা ইসলাম অবধারিত করে দিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ، الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ».

---

[1] সূরা আম্বিয়া: (১০৭)

“হে আল্লাহ, আমি দু’জন দুর্বলের হককে হারাম করছি, ইয়াতিম ও নারী”।[1] নাবালিগ ও ইয়াতীম বাচ্চারা অনুগ্রহের বেশী হকদার, তারা মুরব্বী ও মুয়াল্লিমের মুখাপেক্ষী। তাদের শরীর দুর্বল, জ্ঞান অপরিপক্ক, তাদের সাথে নির্দয় আচরণ করা হারাম। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا».

“সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের ছোটদের রহম করে না ও বড়দের সম্মান জানে না”।[2] শুধু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নয়, ইসলাম প্রত্যেক ক্ষেত্রে দয়ার আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ».

“কোনো বস্তুতে নম্রতা বিরাজ করে না, তবে অবশ্যই ঐ বস্তুকে সে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে এবং কোনো বস্তু হতে নম্রতা ছিনিয়ে নেওয়া হয় না, তবে অবশ্যই তার অনুপস্থিতি ঐ বস্তুকে কলুষিত করে”।[3]

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, শারীরিক শাস্তি বাচ্চাদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সর্বদা কার্যকর নয়। মনোবিজ্ঞানী ও শিশু বিশেষজ্ঞগণ

---

[1] নাসায়ি: (৯১০০), ইবনে মাজাহ: (৩৮৭৮), আহমদ: (৯৩৭৪), হাদিসটি সহি।

[2] তিরমিযি: (১৯২০), আহমদ: (৬৬৯৪)

[3] মুসলিম: (২৫৯৭)

বলেন, শারীরিক শাস্তি বা মারধরকে শিক্ষার উপকরণ জ্ঞান করা ঠিক নয়, কারণ প্রহৃত ছাত্র ও অন্যান্য ছাত্রের মাঝে প্রহার দূরত্ব সৃষ্টি করে, কখনো প্রহারকারী শিক্ষক সম্পর্কে প্রহৃত শিক্ষার্থীর অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়, ফলে শিক্ষক থেকে সে যথাযথভাবে উপকৃত হয় না।

কুরআনুল কারিমের মুয়াল্লিম সর্বদা শিক্ষা-বান্ধব পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। শিক্ষার্থীকে মনোযোগী ও পাঠমুখী করার জন্য অন্যান্য উপকরণ থাকা সত্ত্বে মারধর করা কখনো সঠিক পদক্ষেপ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম শিক্ষক, তিনি কোনো বাচ্চাকে প্রহার করেছেন প্রমাণ নেই। তিনি আমাদের আদর্শ, কুরআনুল কারিমের মুয়াল্লিম তার জীবনী ও কর্মকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবেন, এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ٢١ ﴾ [الاحزاب: ٢١]

“অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে”।[1] আয়েশা রা. বলেন,

---

[1] সূরা আহযাব: (২১)

«مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে কোনো বস্তুকে কখনো প্রহার করেননি, না কোনো নারীকে, না কোনো খাদেমকে, তবে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ভিন্ন বিষয়; আর তাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে প্রতিশোধ নিয়েছেন এমন হয়নি; তবে আল্লাহর নিষিদ্ধ কোনো বস্তু লঙ্ঘন করা হলে তখন তিনি আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন”।[1]

সাবালিগ হওয়ার পূর্বে বাচ্চারা মুকাল্লাফ নয়, তাই তাদের উপর শরয়ী বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য হয় না। তাদেরকে ওয়াজিবের জন্য শাসানো হবে, যেন তারা অভ্যস্ত হয়, মারধর করা যাবে না, কারণ শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরাধ ব্যতীত কাউকে কষ্ট দেওয়া হারাম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ بِغَيۡرِ مَا ٱكۡتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٥٨ ﴾ [الاحزاب : ٥٨]

---

[1] মুসলিম: (২৩৩০)

“আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কৃত কোনো অন্যায় ছাড়াই কষ্ট দেয়, নিশ্চয় তারা বহন করবে অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ”। ইমাম বুখারি রহ. একটি অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন, «بَاب ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى إِلَّا فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ».

“অধ্যায়: মুমিনের পিঠ সংরক্ষিত, তবে হদ অথবা হকের ক্ষেত্রে নয়”। হাফিয ইবনে হাজার রহ. বলেন, “সংরক্ষিত অর্থ সে শাস্তি থেকে নিরাপদ, আর হদ অথবা হক দ্বারা উদ্দেশ্য তাকে শাস্তি প্রদান করা যাবে না বা তাকে অসম্মান করা যাবে না আল্লাহর নির্ধারিত হদ অথবা বান্দার হক ব্যতীত”।[1] হাফিয সাখাবি রহ. বলেন, “বুখারি রহ. এর কথার অর্থ হচ্ছে শরয়ী শাস্তি ব্যতীত তার পিঠে আঘাত করা যাবে না”।[2] অধ্যায়ের উপর্যুক্ত শিরোনাম ইমাম বুখারি রহ. একটি হাদিস থেকে গ্রহণ করেছেন, যা বর্ণনা করেছেন ইমাম তাবরানি রহ. তার মুজাম গ্রন্থে। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى، إِلا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تعالى ».

“মুমিনের পিঠ সংরক্ষিত, তবে আল্লাহর হদের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত নয়”।[3]

---

[1] ফাতহুল বারি: (২/৮৫)

[2] আল-মাকাসিদুল হাসানাহ: (১/৪৪৮)

[3] মুজামুল কাবির লি তাবরানি: (৪৭৬)

আর যেসব হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রহারের কথা বলেছেন, তার অর্থ প্রথমধাপে বেত্রাঘাত কিংবা শারীরিক শাস্তি প্রদান করা নয়, বরং তার পরিবর্তে তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা। কখনো মারধর করার প্রয়োজন হলে সেটাও যেন হয় তার পক্ষে রহমত ও অনুগ্রহ স্বরূপ। কারণ, মারধর ব্যতীত কতিপয় শিক্ষার্থীর সংশোধন না হওয়াও কঠিন বাস্তবতা, তাই আল্লাহ তার অনুমতি প্রদান করেছেন, নির্দিষ্ট সীমা ও পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন, প্রয়োজন শুধু সঠিকভাবে প্রয়োগ করা, তবে তার সুফল পাব।

মারধর করার কুপ্রভাব

এটা শুধু শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে নয়, প্রত্যেক জাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইহুদিদের দেখুন, তারা সর্বত্র কোণঠাসা, কোথাও তাদের স্বাধীন ভূমি নেই, তাই ষড়যন্ত্র, শঠতা ও খারাপ কাজ করা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। তাই ছোট শিক্ষার্থীকে সংশোধন ও আদব শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে পিতা ও মুয়াল্লিমকে অবশ্যই প্রসন্ন হতে হবে, বাচ্চাদের কোণঠাসা ও গোলাম পরিণত করা যাবে না। মুহাম্মদ ইবনে আবু জায়েদ বলেন, “শিক্ষকের পক্ষে সমীচীন নয় কোনো শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনের সময় তিন বারের অধিক বেত্রাঘাত করা”। ওমর রা. বলেন, শরীয়ত যাকে আদব শিক্ষা দেয়নি,

আল্লাহ তাকে আদব শিক্ষা দিবেন না"। তার উদ্দেশ্য শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার সময় নিন্দিত পথ পরিহার করা, একান্ত প্রয়োজন হলে শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করাই যথেষ্ট, কারণ শরীয়তের বিধান প্রদানকারী আল্লাহ তার বান্দার স্বার্থ ও উপকার ভালো বুঝেন।

মারধর অনেক সময় শিক্ষার্থীর জন্য ক্ষতিকর হয় ও তার মাঝে খারাপ স্বভাবের জন্ম দেয়, কঠোর ও রুক্ষ ব্যবহারকারী মুরব্বি বা মুয়াল্লিমের অধীন ছোট বাচ্চা বা শিক্ষার্থীরা সংকীর্ণতা বোধ করে, তাদের চঞ্চলতা বিনষ্ট হয়, তখন তারা মিথ্যা ও অসদাচরণ বেছে নেয়, কঠোরতা থেকে নিষ্কৃতির উপায় হিসেবে প্রতারণা ও শঠতা শিখে। এটা এক সময় তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়, তাদের থেকে সামাজিক ও মানবিক গুণগান নিঃশেষ হয়। তারা অপরের জন্য বোঝায় পরিণত হয়, তাদের নফস উত্তম আদর্শ ও আখলাক শিখতে অলসতা বোধ করে, ফলে তারা ধীরেধীরে পশ্চাৎ মুখী হয়।[1]

শাস্তি প্রদান করার বিধান

---

[1] মুকাদ্দামাহ ইবনে খালদুন, চল্লিশতম ফাসল (অধ্যায়)।

ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকদের নিকট আমানত। তারা শিক্ষার্থীদের ভদ্র আচরণ, ইলম ও আখলাক শেখাবেন, একান্ত প্রয়োজন হলে উত্তম-মাধ্যম করবেন। এটাই হানাফি[1], মালিকি[2], শাফেয়ী[3] ও হাম্বলি[4] ফকিহদের অভিমত। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

"তোমরা সবাই দায়িত্বশীল, সবাইকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে"।[5] অপর হাদিসে তিনি বলেন,

«لَا يَسْتَرْعِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدًا رَعِيَّةً، قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ، إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَقَامَ فِيهِمْ أَمْرَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمْ أَضَاعَهُ؟ حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً».

---

[1] মাবসুদ লি সারাখসি: (১৬/১৩), বাদায়েউস সানায়ে লিল কাসানি: (৭/৩০৫), জামে আহকামুস সেগার: (২/১৬৭), আল-বাহরুর রায়েক লি ইবনে নুজাইম: (৮/৩৯২)

[2] মাওয়াহিবুল জালিল, লিল খতিব: (২/৪৭২), হাশিয়াতুত দুসুকি: (৪/৩৫৪), জাওয়াহিরুল ইকলিল, লিল আবি: (২/২৯৬),

[3] রাওদাতুত তালিবিন, লিন নববি: (১০/১৭৫), মুগনিল মুহতাজ, লিশ শারবিনি: ((৪/১৯৩)

[4] আল-মুগনি লি ইবনে কুদামাহ: (৫/৫৩৭), আল-ফুরু লি ইবনে মুফলিহ: (৬/১০৬)

[5] বুখারি: (৮৯৩)

“আল্লাহ কোনো বান্দাকে যখন কোনো দায়িত্ব প্রদান করেন, কম হোক বা বেশী হোক, তিনি অবশ্যই তাকে কিয়ামতের দিন সে দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন, সে কি তাদের (অধীনদের) মাঝে আল্লাহর বিধান কায়েম করেছে, না বিনষ্ট করেছে? অবশেষে তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে বিশেষভাবে”।[1]

এ হাদিস বলে শিক্ষক ও অভিভাবক সবাই দায়িত্বশীল। শিক্ষার্থী বা পরিবারের কোনো সদস্য অবাধ্য হলে প্রথমত মারধর ব্যতীত শোধরানোর অন্যান্য পদ্ধতি গ্রহণ করুন। তাদের সাথে নম্র আচরণ করুন, পর্যায়ক্রমে সহজ থেকে কঠোর হোন। ওমর ইবনে আবু সালামাহ বলেন,

«كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ».

“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে ছোট বাচ্চা ছিলাম, আমার হাত প্লেটের চতুর্দিক যেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে গোলাম,

[1] আহমদ: (৪৬২৩)

আল্লাহর নাম বল, তোমার ডান হাতে খাও ও তোমার সামনে থেকে খা"।[1]

শিক্ষার্থী কিংবা ঘরের সন্তান যদি ফরজের ক্ষেত্রে অবহেলা কিংবা ওয়াজিবের ক্ষেত্রে ঢিলেমি করে নরম ভাষায় সংশোধন করুন। প্রয়োজন হলে ধমক দিন, অতঃপর কঠোর ভাষায় সতর্ক করুন, যদি তাতে কাজ না হয় উত্তম-মাধ্যম করুন, তবে সালাতের জন্য দশ বছরের পূর্বে মারধর করা যথাযথ নয়।

একটি বিষয় স্মরণ রাখা জরুরি যে, মাদ্রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তম-মাধ্যম বা শাসন বিলুপ্ত করার ঘোষণা অনেক ক্ষেত্রে ভালো ফল নিয়ে আসেনি, কারণ কতিপয় শিক্ষার্থী উত্তম-মাধ্যম ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা ব্যতীত তাদের বদ-অভ্যাস ত্যাগ করে না, এটা মনুষ্য স্বভাব। মারধর বিলুপ্ত করার পক্ষে অবস্থানকারীরা যত যুক্তি ও অজুহাত পেশ করুক তারা দূরদর্শী নয়। এতে সন্দেহ নেই যে, মারধর করার ক্ষেত্রে কতক শিক্ষক থেকে সীমালঙ্ঘন হয়, অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাও ঘটে, তার অর্থ মারধর একেবারে বন্ধ করা নয়। ফকিহগণ বলেন, ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে কাউকে প্রহার করা বৈধ নয়, যার থেকে বাড়াবাড়ির ঘটনা ঘটে তাকে অবশ্যই তার জন্য জবাবদিহি করা উচিত।

---

[1] বুখারি: (৫৩৭৬), মুসলিম: (২০২৩)

“মাওসুয়াতুল ফিকহিয়াহ আল-কুয়েতিয়াহ গ্রন্থে রয়েছে: “সকল আলেম একমত যে, বাচ্চারা যদি সালাত ও তাহারাত ত্যাগ করে এবং ফরজ শিখার ক্ষেত্রে শিথিলতা করে তাহলে অভিভাবকগণ তাদের শাসাবেন, সাত বছরের সময় কথার দ্বারা এবং দশ বছর পূর্ণ হলে প্রয়োজন সাপেক্ষে মারধর করবেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«علموا الصبي الصلاة لسبع سنين ، واضربوه عليها ابن عشر سنين».

“তোমরা বাচ্চাদের সালাত শিক্ষা দাও সাত বছরে এবং তার জন্য প্রহার কর যখন দশ বছর হয়”।[1]

সৌদি আরবের ফতোয়া বোর্ডের ফতোয়া:

শিক্ষার্থীকে প্রহার করা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে সৌদি আরবের ফতোয়া বোর্ডের প্রধান মুফতি বলেন: “আবু বকর রা. তার এক গোলামকে উট হারানোর কারণে মারধর করেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছু বলেননি। শিক্ষক-শিক্ষিকা মনে রাখবেন, মারধর শিক্ষা দান করার এক উপকরণ ও শিক্ষার্থীর বক্রতা সোজা করার এক বৈধপন্থা, ক্রোধ ধমন কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণ করা তার উদ্দেশ্যে মারধর করা বৈধ নয়। তাই একান্ত

[1] তিরমিযি: (৪০৭)

প্রয়োজনে প্রহার করার সময় লক্ষ্য রাখুন যেন ক্ষতি না হয়, শরীরে দাগ না কাটে, হাড্ডি না ভাঙ্গে, অঙ্গহানি না হয় ও ক্ষতের সৃষ্টি না হয়, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ».

"আল্লাহর হদ ব্যতীত দশটি বেত্রাঘাতের বেশী আঘাত করা যাবে না"।[1] স্ত্রী অবাধ্য হলে প্রথমত উপদেশ প্রদান করুন, অতঃপর বিছানা পৃথক করুন, তাতে সংশোধন না হলে আল্লাহ মারধর করার অনুমতি প্রদান করেছেন, তবে তীব্র মারধর নয়। কারণ মারধর করার উদ্দেশ্য স্ত্রীর বক্রতা দূর করা, শক্তি প্রয়োগ ও প্রতিশোধ গ্রহণ করা নয়, শক্তি প্রয়োগ করা আদব শিক্ষা দেওয়ার সঠিক পন্থা নয়"।[2]

শায়খ সালেহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান বলেন, মারধর বাচ্চাদের শাসন করার বৈধ পদ্ধতি, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر».

---

[1] মুসলিম: (১৭০৯), আহমদ: (১৬০৫৬)

[2] গ্রাণ্ড মুফতি ও সৌদি আরবের উলামা পরিষদের চেয়ারম্যান।

“সাত বছর হলে তোমরা তোমাদের সন্তানদের সালাতের নির্দেশ কর, এবং দশ বছর হলে তার জন্য প্রহার কর”।[1] অনুরূপ স্ত্রী অবাধ্য হলে আল্লাহ তাকে শিষ্টাচার শিখানোর জন্য মারধর করার অনুমতি প্রদান করেছেন, তিনি বলেন:

﴿ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ ٣٤ ﴾ [النساء : ٣٤]

“আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তাদের সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদেরকে ত্যাগ কর এবং তাদেরকে প্রহার কর”।[2]

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ».

“আল্লাহর হদ ব্যতীত দশটি বেত্রাঘাতের বেশী কাউকে আঘাত করা যাবে না”।[3]

মুয়াল্লিম ছাত্রকে এবং স্বামী স্ত্রীকে সংশোধন করার জন্য প্রয়োজন হলে মারধর করবেন। যারা প্রহারকে সংশোধন করার পদ্ধতি অস্বীকার করেন, তারা পাশ্চাত্যদের দ্বারা প্ররোচিত। তারা পাশ্চাত্যের আচরণ আমাদের দেশে আমদানি করতে চায়, কারণ তারা সেখান হতে শিক্ষিত এবং তাদের দ্বারা প্ররোচিত। পক্ষান্তরে

---

[1] আহমদ: (৬২১২)

[2] সূরা নিসা: (৩৪)

[3] মুসলিম: (১৭০৯), আহমদ: (১৬০৫৬)

আল্লাহ এবং তার রাসূল ও আদর্শ পূর্বপুরুষদের থেকে প্রমাণিত প্রহার সংশোধন করার একটি পদ্ধতি, তবে অবশ্যই সীমার ভেতর থাকা জরুরি, যেন তীব্র না হয়, চামড়া না ফাটে, হাড্ডি না ভাঙ্গে ও প্রয়োজন অতিরিক্ত না হয়"।[1]

শায়খ ইবনে বায রহ. বলেন, "দশ বছর বয়স হলে সালাত ও বাড়ির কাজের জন্য অভিভাবকগণ সন্তানদের শাসন করবেন, প্রয়োজন হলে হালকা প্রহার করবেন, যেন কোনো ক্ষতি না হয় এবং উদ্দেশ্য হাসিল হয়"।[2]

শায়খ মুহাম্মদ কুতুব বলেন, "মানুষকে আদব ও শিষ্টাচার শিখানোর জন্য শাস্তি প্রয়োগ করা স্বভাবগত বিষয়, বিশেষভাবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। তাই বাচ্চাদের প্রতি দয়ার নামে তা অস্বীকার করা যায় না, কিংবা এ ক্ষেত্রে মুয়াল্লিমকে নিয়ন্ত্রণ করা যথাযথ নয়। বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা বলে, যে প্রজন্ম শাস্তি বিহীন ও শাস্তি নিষেধাজ্ঞার পরিবেশে বড় হয়, তারা অনেক ক্ষেত্রে অচেতন হয়, উন্নত জীবন গঠন ও কঠিন মুহূর্তে সামাজিক অবদান রাখতে তারা ব্যর্থ। অতএব অভিজ্ঞতার তুলনা নেই। প্রহার না করার থিউরি যত মুখরোচক হোক, তা সবার জন্য কল্যাণকর নয়। শিক্ষার্থীদের উপর প্রকৃত দয়া হচ্ছে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য

---

[1] ইগাসাতুল মুসতাফিদ বি শারহি কিতাবুত তাওহীদ: (পৃ.২৮২), (পৃ.২৮৪)

[2] ফতোয়া শায়খ ইবনে বায।

তাদেরকে যোগ্য করে তুলা, তাদের বিনষ্ট করার মাঝে কোনো দয়া নেই"।[1]

প্রহার করার শর্তসমূহ

এতে সন্দেহ নেই যে, কতক শিক্ষার্থীকে মারধর ব্যতীত সংশোধন করা সম্ভব নয়, তবে তার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে, যা রক্ষা করা হলে প্রহার সুফল বয়ে আনে এবং শিক্ষার্থীর জীবন বিচ্যুতি থেকে সংশোধনের পথে পরিচালিত হয়। নিম্নে মারধর করার কয়েকটি শর্ত উল্লেখ করছি:

প্রথম শর্ত: পড়া-শুনায় অবহেলা কিংবা অসংলগ্ন আচরণের জন্য মুয়াল্লিম প্রথমধাপে শিক্ষার্থীকে প্রহার করবেন না, বরং প্রহার করার পূর্বের ধাপগুলো অনুসরণ করুন। ভুলগুলো স্মরণ করিয়ে দিন, বুঝান ও সংশোধন করুন, এতে কাজ না হলে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করুন, কিন্তু গালমন্দ ও খারাপ শব্দ প্রয়োগ করবেন না।

মুকাদ্দামাহ ইবনে খালদুনে বর্ণিত আছে, বাদশাহ হারুনুর রশিদ স্বীয় সন্তানের শিক্ষক মুহাম্মদ আমীনকে ওসিয়ত করেন, "প্রতিটা মুহূর্ত আপনি তাকে উপকৃত করার চেষ্টা করুন, তবে তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবেন না, তাহলে তার ব্রেন মেরে ফেলবেন। আর

---

[1] মানহাজুত তারবিয়াহ আল-ইসলামিয়াহ, মুহাম্মদ কুতব: (পৃ.১৩৫-১৩৬)

তাকে অধিক ছাড় দিবেন না, তাহলে সে অলসতাকে বেছে নিবে ও সময়ের অপব্যবহার করবে, যথাসম্ভব তাকে কাছে টেনে ও তার সাথে নম্র আচরণ করে তাকে সঠিক পথে রাখার চেষ্টা করুন, যদি সে এতে শুধরাতে না চায় তাহলে কঠোর হোন ও কঠোরতা করুন"।[1]

দ্বিতীয় শর্ত: প্রহার করার জন্য শিক্ষার্থীর মাঝে আদব ও শিক্ষা কি জিনিস বুঝার জ্ঞান থাকা জরুরি, যারা বুঝে না তাদের মারধর করা বৈধ নয়। শিক্ষার্থীর বয়স ও অপরাধ উভয়ের প্রতি নজর রেখে শাস্তি প্রদান করা চাই, যেন কোনো ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন না হয়।

ছাত্রকে প্রহার করা সম্পর্কে ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেন, "বাচ্চাদের অপরাধ অনুযায়ী প্রহার করা দোষণীয় নয়, তবে প্রহার করার পথ পরিহার করা ভালো, আর বাচ্চা অবুঝ হলে প্রহার করা বৈধ নয়"।[2]

---

[1] মুকাদ্দামাহ ইবনে খালদুন: (৪৫১)

[2] আল-মুগনি লি ইবনে কুদামাহ: (৫/৫৩৭), হাশিয়াতুল জামাল আলা শারহিল মিনহাজ: (৫/১৬৪), আল-মিয়ার লিল আতাশরিসি: (৮/২৫৬), আল-আদাবুশ শারিয়াহ, লি ইবনে মুফলিহ: (১/৫০৬)

ফতোয়া বারজিলিতে রয়েছে, “শিক্ষার্থীরা কেউ হয় শক্তিশালী ও কেউ হয় দুর্বল, তাই তাদের অপরাধ ও শক্তি মোতাবিক প্রহার করা বাঞ্ছনীয়, কারণ সবার অপরাধ ও ধৈর্য ক্ষমতা সমান নয়”।[1]

ইবনে হাজিব রহ. বাচ্চাদের মুয়াল্লিম সম্পর্কে বলেন, “যে সব বাচ্চা শরয়ী কারণ ব্যতীত স্বীয় দায়িত্বে অবহেলা করে, তাদের কারো জন্য শুধু চেহারার বিরক্তি প্রকাশ করা যথেষ্ট, কারো জন্য শক্ত কথা ও ধমকের প্রয়োজন হয়, আবার কাউকে প্রহার করা জরুরি হয়, প্রত্যেকের সাথে তাদের অবস্থা বুঝে ব্যবহার করা সমীচীন“।[2]

তৃতীয় শর্ত: মুয়াল্লিম যদি মনে করেন প্রহার করলে সংশোধন হবে তাহলে প্রহার করবেন, অন্যথায় প্রহার করা বৈধ নয়। কারণ প্রহার করার উদ্দেশ্য সংশোধন করা, যদি সংশোধন না হয় তাহলে প্রহার করার কোনো অর্থ নেই।[3]

চতুর্থ শর্ত: মুয়াল্লিম নিজে শিক্ষার্থীকে শাস্তি দিবেন।[4]

---

[1] ফতোয়ার বারজিল: (৫৭৪/৩)

[2] আল-মাদখাল: (২/৪৫৯)

[3] আল-মিয়ার লিল আতাশরিসি: (৮/২৫০, ২৫৮), আল-ফাওয়াকিহুদ দানি, লিন নাফরাওয়ি: (২/১২৪), ফতোয়ার বারজালি: (৩৮/৫৭৪)

[4] আল-মাওয়াহিবুল জালিল, লিল হুতাব: (৪/১৫), তাবসিরাতুল আহকাম, লি ইবনে ফারহুন: (৩/৩০১), আসনাল মাতালিব, লিল আনসারি: (৩/২৩৯),

পঞ্চম শর্ত: গোস্বার সময় প্রহার না করা, কারণ তখন প্রহার করার উদ্দেশ্য সংশোধন না হয়ে গোস্বা নিবারণ করা হতে পারে।

ষষ্ঠ শর্ত: প্রহার করার সময় প্রহারের প্রকৃতি, পরিমাণ ও জায়গা ঠিক থাকা চাই। প্রকৃতি ঠিক থাকার অর্থ হালকা ও মৃদু প্রহার করা, পরিমাণ ঠিক থাকার অর্থ তিন বারের অধিক আঘাত না করা, জায়গা ঠিক থাকার অর্থ যেসব স্থানে প্রহার করা বৈধ নয় সেখানে প্রহার না করা, যেমন চেহারা, মাথা, বুক, পেট ও স্পর্শকাতর অঙ্গ। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ».

"যখন তোমাদের কেউ আঘাত করে সে যেন চেহারায় আঘাত না করে"।[1]

কখনো পরিবেশের কারণে শাস্তির ধরণ বিভিন্ন হয়, যেমন কোথাও কান ধরে দাঁড় করানো দোষণীয়, আবার কোথাও দোষণীয় নয়। তাই শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন হলে অবশ্যই স্থানকাল পাত্র বিবেচনা করে রুচি সম্মত শাস্তি প্রদান করুন। প্রয়োজনে সহকর্মী, পরিচালক ও অন্যান্যদের সাথে শিক্ষার্থীর অপরাধ ও মুয়াল্লিমের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।

মুগনিল মুহতাজ, লিশ শারবিনি: (৪/১৯২), রাওদাতুত তালিবিন, লিন নাবাবি: (১০/১৭৫), তাহরিরুল মাকাল লি ইবনে হাজার: (পৃ.৮০)

[1] বুখারি: (২৫৬০), মুসলিম: (২৬১২)

সপ্তম শর্ত: হানাফি,[1] মালিকি[2] ও শাফিয়ি[3] মাজহাবের অধিকাংশ ফকিহ বলেছেন বাচ্চাদের মারধর করার জন্য অভিভাবকের অনুমতি জরুরি। কারণ, শাস্তি প্রদান করা একটি শরয়ী বিধান, যা শাসক বা অভিভাবকের মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত। মুয়াল্লিম শাসক বা অভিভাবকের মর্যাদা সম্পন্ন নয়, তাদের প্রতিনিধি মাত্র, তাই তার শাস্তি প্রদান করার জন্য অভিভাবকের পূর্বানুমতি প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত শিক্ষার উদ্দেশ্য কাউকে প্রেরণ করার অর্থ মারধর করার অনুমতি প্রদান করা নয়, কারণ শিক্ষার সাথে তার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক নেই। কতক অভিভাবক শিক্ষার অনুমতি দেন, কিন্তু মারধর করার অনুমতি দেন না, তাই তাদের চুপ থাকা সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি উভয় হতে পারে, অতএব স্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত প্রহার করা যাবে না"।[4]

---

[1] বাদায়েউস সানায়ে লিল কাসানি: (৭/৩০৫), হাশিয়াতুত তাহতাবি আলাদ দুররিল মুখতার: (৪/২৭৫), হাশিয়াতু ইবনে আবেদিন: (৬/৫৬৭), জামেউ আহকামিস সিগার: (২/১৬৮)

[2] জাওয়াহিরুল ইকলিল: (২/২৯৬)

[3] হাশিয়াতুশ শুবরামলিসি, আলা নিহায়াতিল মিনহাজ: (৮/২৮), রাওদাতুত তালেবিন, লিন নাববি: (১০/১৭৫)

[4] হাশিয়াহ ইবনে আবেদিন: (৩/১৮৯), তাহরিরুল মাকাল, লি ইবনে হাজার আল-হায়সামি: (পৃ.৭৭), রাওদাতুত তালেবিন, লিন নববি: (১০/৩২৭), মুগনিল মুহতাজ: (৪/১৯৩)

হাম্বলি[1] ও মালিকি[2] মাজহাবের সর্বশেষ ফতোয়া ও শাফিয়ি মাজহাবের[3] কতক ফকিহ বলেন, “শিক্ষার্থীকে প্রহার করার জন্য অভিভাবকরে অনুমতির প্রয়োজন নেই, কারণ, শিক্ষার্থীকে প্রহার করার ক্ষেত্রে সবার মৌন সমর্থন রয়েছে”।[4]

অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত শিক্ষার্থীকে প্রহার করা বৈধ এ কথাই সঠিক। কারণ মুয়াল্লিমের প্রহার করার বিষয়টি সমাজে প্রচলিত, তার জন্য অনুমতির প্রয়োজন হয় না।[5] দ্বিতীয়ত অপরাধের জন্য শিক্ষার্থীকে প্রহার করা অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে হলে অন্যদের মাঝে ইনসাফ করা সম্ভব নয়। তখন মুয়াল্লিম অনুমতির ভিত্তিতে কাউকে মারবে, কাউকে মারবে না, এরূপ আচরণ এক প্রতিষ্ঠানে কল্যাণকর নয়।

---

[1] আল-মুগনি লি ইবেন কুদামাহ: (৫/৫৩৭), (৮/৩২৭), শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, লিল বাহুতি: (৩/৩০৫), আল-ফুরু লি ইবনে মুফলিহ: (৬/১০৬), আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ, লি আবি ইয়ালা: (পৃ.২৮২),

[2] হাশিয়াতুত দুসুকি আলাশ শারহিল কাবির: (৪/৩৫৪)

[3] মুগনিল মুহতাজ, লিশ শারবিনি: (৪/১৯৩)

[4] তাহরিরুল মাকাল লিল হায়সামি: (৭৮), মুগনিল মুহতাজ, লিশ শারবিনি: (৪/১৯৩), আল-মুবদি, লি ইবনে মুফলিহ: (৮/৩৪১)

[5] মাজমু ফতোয়া ইবনে তাইমিয়াহ: (১১/৪২৭), (২৯/২০), আল-মুগনি লি ইবনে কুদামাহ: (৮/৩২৭)

যেসব প্রতিষ্ঠানে মারধর করা নিষেধ, সেখানে কাউকে ভর্তি করার অর্থ তাকে মারধর করার অনুমতি নেই। আর যেখানে মারধর করা নিষেধ নয়, সেখানে কাউকে ভর্তি করার অর্থ হচ্ছে সমাজের রীতি মোতাবেক প্রয়োজন সাপেক্ষে প্রহার করা বৈধ।

অপরাধের শ্রেণীভাগ

শিক্ষার্থীদের অপরাধগুলো দু'প্রকার: ১. অপরাধের অনিষ্ট ও প্রভাব খোদ শিক্ষার্থীর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে, তার দ্বারা অন্যরা প্রভাবিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, যেমন ক্লাসে অমনোযোগী থাকা বা ক্লাসে অনুপস্থিত থাকা বা ক্লাসের পড়া যথারীতি সম্পন্ন না করা ইত্যাদি। এ জাতীয় অপরাধ গৌণ, তার জন্য শাস্তি কম হবে| এ সমস্যার জন্য অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করা ও তাদেরকে বিষয়গুলো জানিয়ে রাখা জরুরি। মুয়াল্লিম লক্ষ্য রাখবেন, কারো প্রতি বেশী যত্নশীল হতে গিয়ে মনোযোগী শিক্ষার্থীদের আমানত নষ্ট করা যাবে না।

২. শিক্ষার্থীর অপরাধের কারণে অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেমন অন্যকে পড়তে না দেওয়া, কিংবা কারো শরীরে আঘাত করা বা ক্লাসে অস্বাভাবিক আচরণ করা, যার দ্বারা অন্যদের মনোযোগ ও পড়াশুনার পরিবেশ নষ্ট হয়। এ জাতীয় অপরাধ কোনো শিক্ষার্থী থেকে প্রথমবার সংগঠিত হলে খোদ মুয়াল্লিম সংশোধন করার

চেষ্টা করুন, প্রয়োজনে পরিচালক বা দায়িত্বশীলদের সাথে আলোচনা করুন। দ্বিতীয় বার সংগঠিত হলে প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীল, প্রয়োজনে অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করুন, তারা আপনাকে অনেক সমাধান বলে দিবেন, বিশেষ করে অভিভাবকগণ।

এ জাতীয় অপরাধ যদি ক্লাসে বারবার সংগঠিত হয়, কিংবা তার দ্বারা পড়াশুনার পরিবেশ নষ্ট হয়, কিংবা অপরাধের প্রকৃতি মারাত্মক হয়, তাহলে দায়িত্বশীলদের তড়িৎ ব্যবস্থা নিতে বলুন, কোনো কারণে বিলম্ব হলে দুষ্ট ছাত্রকে ক্লাসের বাইরে কিংবা অন্যদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখুন, যেন অন্য ছাত্ররা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আর এ জাতীয় অপরাধ যদি ক্লাসের বাইরে সংগঠিত হয় তাহলে তার শাস্তি প্রদান থেকে মুয়াল্লিমের বিরত রাখা নিরাপদ। ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীলের উপর তার বিচার ভার ছেড়ে দিন।

শিক্ষক শিক্ষার্থীকে গবেষণা করুন, তার স্বভাব, মানসিকতা ও শারীরিক অবস্থা বুঝার চেষ্টা করুন, তার অপরাধ সম্পর্কে অভিভাবকের সাথে আলোচনা করুন, তারা আপনাকে শিক্ষার্থী সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও সমাধানের পথ বাতলে দিবেন। কারণ কোনো শিক্ষার্থীর মাঝে কঠিন রোগ বা স্পর্শ কাতর অপারেশন থাকতে পারে, তখন সামান্য আঘাত বড় বিপদ ডেকে আনবে, তাই অপরাধ যত বড় হোক তাড়াহুড়ো পরিত্যাগ করুন। কারণ

ক্ষমা করে ভুল করা ভালো, কিন্তু শাস্তি দিয়ে ভুল করা ভালো নয়।

সাংবাদিক ও মিডিয়ার বাড়াবাড়ি

প্রহার করার ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষক বা কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কখনো ভুল কিংবা রুচি বিরুদ্ধ কিছু সংগঠিত হলে কতক সাংবাদিক অভিযুক্ত শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। তারা মারধর ও প্রহারের বিপক্ষে অবস্থান নেয়, অবস্থান নেয় শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিপক্ষে, ঘটা করে প্রচার করে ভুলগুলো, ফলে অভিযুক্ত শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের কোনো মূল্য শিক্ষার্থী বা সাধার মানুষের মাঝে অবশিষ্ট থাকে না। তারা সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে অশ্রদ্ধা করতে শিখে, পরবর্তীতে তা অন্যান্য শিক্ষক পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে, ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক দু'মেরুতে অবস্থান নেয়, তাদের মাঝে ক্রমশ দূরত্ব বাড়তে থাকে। এভাবে শিক্ষাঙ্গন থেকে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিলুপ্ত হয়। অতএব শিক্ষার স্বার্থে এ জাতীয় সাংবাদিকতা পরিহার করাই মঙ্গল।

কোনো শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কখনো ভুল হলে লেখক বা সাংবাদিকদের করণীয় শিক্ষার্থীদের ধৈর্যশীল হতে উপদেশ দেওয়া, তাদেরকে বলা আল্লাহকে ভয় কর, স্বীয় দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হও এবং পড়া-শুনার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানকে

সহযোগিতা কর, এতেই তোমাদের কল্যাণ। অনুরূপ শিক্ষককে বলা আপনারা সতর্ক হোন, আপনারা আদর্শ, আপনাদের থেকে এ জাতীয় ভুল কাম্য নয়। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয় পক্ষে থাকবেন সাংবাদিক ও লেখকগণ, উভয়কে উপকারী পরামর্শ দিবেন। সবাইকে শাস্তি দেওয়া কিংবা সবাইকে ছাড় দেওয়া তাদের পেশাদারিত্ব ও জাতির প্রতি সুবিচার নয়।

শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ নিজেদের ভুল বুঝার সাথে সংশোধন করার ব্যবস্থা নিন ও অধিক তৎপর হোন। মানুষ মাত্র ভুল হওয়া স্বাভাবিক, তাই ভুলকে আড়াল বা গোপন করে নয়, বরং স্বীকার করে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হোন। আপনাদের শিক্ষা যেরূপ আদর্শ, ভুলও যেন হয় আদর্শ। আপনাদের ভুল থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের ভুল পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে শিখবে। শিক্ষক একজন ডাক্তার, যখন আদব দেওয়ার প্রয়োজন আদব দিবেন, যখন প্রয়োজন নেই বিরত থাকবেন।

প্রহার নিষিদ্ধ করার বিধান

কতক শর্ত ও নিয়ম নীতি অনুসরণ করে প্রহার করা বৈধ হলেও সকল যুগ, সকল প্রতিষ্ঠান ও সকল পরিবেশের ক্ষেত্রে তা উপযুক্ত নয়, বরং ব্যক্তি ও তার অবস্থা ভেদে সংশোধন পদ্ধতি পৃথক হয়, যেমন বলা হয়, “পরাধীনের জন্য লাঠি, আর স্বাধীনের

জন্য ইশারা"। আবার পরিবেশ ও অবস্থার ভিন্নতার কারণে একই ব্যক্তির সংশোধন পদ্ধতি বিভিন্ন হয়, কখনো বিরক্তি প্রকাশ করা তার জন্য যথেষ্ট হয়, কখনো ধমক বা প্রহার করার প্রয়োজন হয়।

বর্তমান কতক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের প্রহার বা মারধর করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। কারণ, প্রহার অনেক সময় শাস্তি বা শারীরিক আঘাতে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং প্রতিশোধ নেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যা হারাম কোনো সন্দেহ নেই। তবে অনেক শিশু বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ বলেন, প্রয়োজনে হালকা প্রহার শিক্ষার জন্য সহায়ক, যদি শিক্ষার্থীর বয়স, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিচার করে প্রয়োগ করা হয় এবং যাদের জন্য প্রহার উপযুক্ত নয় তাদেরকে নিরাপদ রাখা হয়।

প্রকৃতপক্ষে কাকে কি পরিমাণ প্রহার করা উপকারী, কার জন্য উপকারী নয় এসব বিষয় নিয়ম কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। কে ঠিক করল আর কে ভুল করল চিহ্নিত করার কোনো মাপকাঠি নেই। অনেক শিক্ষক প্রহার করার অনুমতির প্রতি সুবিচার করেন না, ফলে এমন কিছু ঘটে যার পরিণতি ভালো হয় না। ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকের মাঝে দূরত্ব ও শত্রুতার সৃষ্টি হয়।

অতএব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়ানোর জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান যদি মারধরকে নিষিদ্ধ করে, সেটা তাদের ইখতিয়ার ভুক্ত। শিক্ষার্থীর অপরাধ যদি বড় হয়, যার জন্য শরয়ী হদ বা শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে, সেটা বাস্তবায়নের জন্য মুসলিম সরকার প্রয়োজন; আর অপরাধ যদি ছোট হয়, যার জন্য তাজির নির্ধারিত, অর্থাৎ তার শাস্তির পরিমাণ মুসলিম শাসক বা বিচারকের উপর ন্যস্ত, শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নয়, তাও শাসক কিংবা ক্ষমতাধর ব্যক্তি ব্যতীত বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

অতএব কোনো প্রতিষ্ঠান-কর্তৃপক্ষ যদি প্রহার নিষেধ করে, প্রহারকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়, সেটা তাদের ইচ্ছাধীন। কারণ শরীয়ত যেখানে বৈধ বস্তুকে নিয়মের অধীন বেঁধে দেওয়ার ইখতিয়ার শাসককে প্রদান করেছে, সেখানে কোনো বস্তু থেকে খারাপ কিছুর আশঙ্কা হলে নিয়মের অধীন নিয়ে আসা বৈধ সন্দেহ নেই, যেমন প্রহার করা। আর যদি হালাল-হারাম তোয়াক্কা করা না হয়, তাহলে মারধর নিষেধ করাই শরীয়তের দাবি। অতএব কর্তৃপক্ষ চাইলে প্রহার করার বিধান নিয়ন্ত্রণ কিংবা রহিত করার ইখতিয়ার রাখেন। যে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের প্রহার করা নিষেধ সেখানে শাসন পদ্ধতি কি হবে সাধারণ শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃপক্ষ থেকে জেনে নিন। এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের উপর চাপ কম হয়,

কিছু নীতিমালা জানা থাকলে সহজ ও আনন্দদায়ক বটে। আল্লাহ ভালো জানেন।

সাধারণ হিফয খানা

সাধারণ হিফয খানা বলতে কওমি মাদ্রাসার অধীন হিফয খানা কিংবা কওমি ধারায় পরিচালিত স্বতন্ত্র হিফয খানাকে বুঝানো হয়। বাংলাদেশসহ ভারত উপমহাদেশে হিফয খানা, হাফেযি মাদ্রাসা কিংবা হিফয শাখার অর্থ এসব মাদ্রাসা, যেখানে শুধু কুরআনুল কারিম মুখস্থ করানো হয়। অবশ্য বর্তমান কতক হিফয খানায় কুরআনুল কারিম মুখস্থ করানোর পাশাপাশি সীমিত আকারে বাংলা, ইংরেজি ও অংক পড়ানো হয়।[1] এতে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয় ফজরের পূর্বে ঘুম থেকে ওঠার পর, অতঃপর অব্যাহত থাকে এশার পর ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত। সাধারণ হিফয খানায় শিক্ষার্থীর চব্বিশ ঘণ্টা রুটিন মোতাবেক নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাই এতে অনাবাসিক শিক্ষার্থী থাকে না বললে চলে, যদিও থাকে সেটি নাজেরা বা নুরানি গ্রুপের ক্ষেত্রে।

---

[1] প্রত্যেক হিফজ খানায় তিন প্রকার শিক্ষার্থী থাকে: হিফজ, নাজেরা ও কায়েদা গ্রুপ।

সাধারণত এসব হিফয খানায় ফজর-আযানের আধা ঘণ্টা পূর্বে ছাত্রদের ঘুম থেকে জাগানো হয়।[1] অতঃপর ফজর সালাতের পূর্ব পর্যন্ত তারা সবক শুনায়। ছাত্র-শিক্ষক সবাই পরিশ্রমী হলে ফজর-সালাতের পূর্বে সবক শুনানো শেষ| ফজর সালাতের পর থেকে নাস্তার ছুটির পূর্ব পর্যন্ত সাত-সবক শুনানোর সময়| ছাত্র-শিক্ষক সবাই পরিশ্রমী হলে এ সময় সবার সাত-সবক শুনানো সমাপ্ত হয়| নাস্তার পর থেকে সকালে ঘুমানোর ছুটির আগ পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা আমুখতাহ মুখস্থ করে। দেড় থেকে দুই ঘণ্টা ঘুমানোর পর জোহর সালাতের পূর্বে ওঠে শিক্ষার্থীরা আমুখতা শুনায়, জোহরের সালাত ও দুপুরের খাবারের বিরতি শেষে পুনরায় আমুখতা শুনায়। ছাত্র-শিক্ষক সবাই পরিশ্রমী হলে আসর সালাতের এক বা ধের ঘণ্টা পূর্বে আমুখতা শুনানো শেষ হয়, কারও ক্ষেত্রে সামান্য বিলম্ব হয়, তবে সবাই আসরের পূর্বে আমুখতা শুনিয়ে শেষ করে| আমুখতা শেষে আসরের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা সবকের নাজেরা ও বিশুদ্ধতা ঠিক করে নেয়, কখনো মুয়াল্লিমকে শুনিয়ে কখনো অপর ছাত্র-ভাইকে শুনিয়ে, যারা জোহরের সালাতের পূর্বে আমুখতা শোনায় এ সময় তারা পিছনের

[1] মৌসুম পরিবর্তের কারণে কখনো রুটিন পরিবর্তন হয়।

পড়া পড়ার খুব সময় পায়। আসর[1] থেকে মাগরিব পর্যন্ত খেলা-ধুলার বিরতি। মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা সবক মুখস্থ করে, এশার পর ঘুমের আগ পর্যন্ত তারা পিছনের পড়া পড়ে, এতে সাধারণত সকালের সাত-সবক মুখস্থ করে। সাধারণ হিফয খানায় এটাই স্বাভাবিক নিয়ম, মৌসুম ভিন্নতা ও দিন-রাত দীর্ঘ-হ্রাসের কারণে সময়সূচী সামান্য পরিবর্তন হয়, তবে মৌলিক পড়া-শুনা ও নির্ঘণ্ট এতে সীমাবদ্ধ থাকে।

সকালে সবক শুনানোর পর সাত-সবক, সাত-সবক শুনানোর পর পিছনের পড়া তিলাওয়াত বা আমুখতা মুখস্থ করা হয়, অতঃপর দুপুরে ঘুম থেকে ওঠে আমুখতা শুনানো হয়, আমুখতা শুনানোর পর আসরের আগ পর্যন্ত পিছনের পড়া তিলাওয়াত ও সবকের পড়ার তিলাওয়াত বিশুদ্ধ ও দ্রুত করা হয়, মাগরিবের পর সবক

---

[1] প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগণ হলে বাংলাদেশসহ ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশ জায়গায় আসর সালাত পড়া হয়। আহলে-হাদিস প্রধান এলাকায় প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হলে আসর সালাত পড়া হয়। উল্লেখ্য, মুসলিম জাতি যখন হানাফি ও আহলে-হাদিসের ন্যায় সাম্প্রদায়িক নাম পরিত্যাগ করে মুসলিম নাম গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হবেন এবং কুরআন ও হাদিসের অনুসরণকে কর্তব্য জ্ঞান করবেন, তখনি জাতি তাদের দ্বারা উপকৃত হবে। সাহাবায়ে কিরাম ও আমাদের পূর্বপুরুষ তথা সালাফদের কেউ সালাফী ও আহলে-হাদিস নাম গ্রহণ করেননি, তবে হাদিসের অনুসারী অবশ্যই ছিলেন।

মুখস্থ এবং এশার পর সাত-সবক কিংবা পিছনের পড়া তিলাওয়াত করা হয়।

হিফয খানায় ব্যবহৃত কতক পরিভাষা: সাধারণ হিফয খানায় সবক, আমুখতা, সাত-সবক, সবকের পারা, সবিনা ও লুকমা ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। নিম্নে এসব পরিভাষার অর্থ ও প্রয়োগ পেশ করছি:

সবক বা নতুন হিফয: সাধারণ হিফয খানায় মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত সময়ে শিক্ষার্থীরা সবক বা নতুন হিফয মুখস্থ করে, অতঃপর ঘুম থেকে উঠে ফজর সালাতের পূর্বে সবক শুনানো শেষ করে। কোনো শিক্ষার্থী আমুখতা শেষ করে আসর সালাতের পূর্বে তিন-চার বার সবকের পৃষ্ঠা পড়ে সবকের নাজেরা গতিশীল ও তার শুদ্ধাশুদ্ধি ঠিক করে নেয়। অতঃপর মাগরিবের পর শুধু সবক মুখস্থ করে এবং ঘুম থেকে ওঠে ফজরের পূর্বে তা শুনায়। অধিকাংশ শিক্ষার্থী নাজেরা শেষে হিফয গ্রুপে উত্তীর্ণ হয়ে পূর্ণ এক পৃষ্ঠা সবক শুনায়।

বছরে আনুমানিক ৩-মাস ছুটি ও সবক চলাকালীন ৯-মাসের ৩৮-টি শুক্রবার ব্যতীত অন্যান্য দিন যদি শিক্ষার্থী রীতিমত উপস্থিত থাকে ও সবক শুনায়, তাহলে প্রথম বছর একজন শিক্ষার্থীর ৭-১০ পারা মুখস্থ হয়। দ্বিতীয় বছর ১২-১৫ পারা ও তৃতীয় বছর অবশিষ্ট ৫-১১ পারা মুখস্থ হয় এবং তিন বছরে হিফয সমাপ্ত হয়।

অধিকাংশ শিক্ষার্থী শুনানিসহ এ সময়ে হিফয সমাপ্ত করে, নুরানি বা কায়েদার এক বছরসহ মোট চার বছরে একজন মধ্যম মেধার অধিকারী শিক্ষার্থী এ জাতীয় খানায় হিফয সমাপ্ত করতে সক্ষম। কতক শিক্ষার্থী প্রথম বছর ৫-লাইন কিংবা ১০-লাইন সবক শুনায়, তাদের সময় কিছুটা বেশী লাগে। অনেক শিক্ষার্থী তৃতীয় বছর প্রথমার্ধে হিফয সমাপ্ত করে দ্বিতীয়ার্ধে কয়েক খতম শুনিয়ে পরবর্তী বছর কওমি কিংবা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়, কেউ ভর্তি হয় স্কুলে। আর যারা পূর্ণ তিন বছরে হিফয করে, তারা পরবর্তী চতুর্থ বছর পুরোটা খতম শুনায়। বারবার হিফয শুনানোর ফলে হিফয পাকা-পোক্ত হয় ও ভুলভ্রান্তি মুক্ত হয়।

সাত সবক: সাত সবক অর্থ সবকের অনুগামী সবক। উদাহরণত কেউ ৫-নং পারার ৫-নং পৃষ্ঠা সবক শোনাল, তার সাত সবক হচ্ছে ৫-নং পারার ১-৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। আগামীকাল যখন সে ৬-নং পৃষ্ঠা সবক শোনাবে, তখন তার সাত সবক হবে ১-৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। আবার যখন ১৯-তম পৃষ্ঠা সবক শুনায়, তখন ১-১৮ পৃষ্ঠা সাত সবক হয়। শিক্ষার্থী যে দিন ২০-নং পৃষ্ঠা সবক শুনিয়ে পারা শেষ করে, সে দিন তার সাত সবক থাকে না, তখন তাকে শুনাতে হয় 'সবকের পারা'।

সবকের পারা: শিক্ষার্থী যখন কোনো পারার সবক শেষ করে, তখন উক্ত পারা বিশেষ গুরুত্ববহ হয়ে যায়। হাফিয সাহেব খুব

গুরুত্বসহ সবকের পারা শ্রবণ করেন। এতে শব্দ ও হরকতের ভুল কিংবা মুখস্থ বা ইয়াদের দুর্বলতা গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের উস্তাদকে দেখেছি, তিনি খুব ধৈর্যসহ ৩০-৩৫ মিনিট কিংবা তার চেয়েও বেশী সময় নিয়ে আমাদের সবকের পারা শ্রবণ করতেন। সবকের পারা শুনার সময় অন্য কোনো ছাত্রের সবক, সাত সবক কিংবা আমুখতা শুনতেন না, শুধু সবকের পারা শ্রবণ করতেন। কখনো সময় স্বল্পতা কিংবা একান্ত প্রয়োজন হলে কোনো হাফিয ছাত্রকে নিজের পাশে বসিয়ে সবকের পারা শুনতে বলতেন, তার প্রতি নির্দেশ থাকত কিছু বলে দিবে না, শুধু এক-দু'বার দোহরানোর সুযোগ দিবে। অতঃপর তিনি অন্যদের থেকে আমুখতা বা সাত সবক শ্রবণ করতেন, মাঝে-সাজে সবকের পারার প্রতি মনোযোগী হতেন। মুখস্থ দুর্বল হলে পুনরায় পড়ে আসতে বলতেন এবং শুরু থেকে শুনাতে বলতেন।

রীতিমত সাত সবক শুনানোর ফলে পারার প্রতি পৃষ্ঠা খুব মুখস্থ হয়, তাই কতক শিক্ষার্থী সকালে সবক শেষ করে দুপুরে সবকের পারা শুনায়। অবশ্য অধিকাংশ শিক্ষার্থী যে দিন সকালে সবক শেষ করে, তার পরের দিন সকালে সবকের পারা শুনায় এবং নাস্তার আগে সবকের পারা শুনিয়ে শেষ করে। তবুও কারো সবকের পারা যদি কোনো কারণে দুর্বল হয়, যেমন অসুখ কিংবা অনুপস্থিতি কিংবা মনোযোগিতার অভাবে, তার প্রতি নির্দেশ

থাকত সকাল-বিকাল আধা-পারা করে শুনিয়ে পরদিন সবকের পারা শুনাও। তাতেও সম্ভব না হলে সকাল-বিকাল পাঁচ পৃষ্ঠা করে একদিন আধা পারা শুনাও, দ্বিতীয় দিন এভাবে আধা-পারা শুনাও, অতঃপর তৃতীয় দিন সবকের পারা পূর্ণ শুনাও। ভুল ও দোহরানো ব্যতীত সবকের পারা শুনানোর জন্য কখনো পুরষ্কার ঘোষণা করতেন। বিশেষ করে দুর্বল ছাত্রদের ব্যাপারে এমনটি বেশী হত।

আমাদের উস্তাদ সবক ও সবকের পারা দু'টি বিষয় খুব গুরুত্ব দিতেন। এ দু'টি সবক তিনি নিজে শুনতেন এবং একজন একজন শিক্ষার্থী থেকে শুনতেন। তিনি কুরআনুল কারিমের প্রতি নজর রেখে শ্রবণ করতেন, যত সহজ পড়া হত কিংবা যত পরিচিত সূরা হত এতে তার স্বভাব বা নিয়মের ব্যত্যয় ঘটতে দেখি নাই। কুরআনুল কারিমের প্রতি নজর থাকলে শ্রবণকারী মুয়াল্লিমের খেয়াল বিচ্যুত হয় না। দ্বিতীয়ত অপর আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যতা জনিত সন্দেহ সৃষ্টি হয় না, কারণ আয়াতের প্রতি নজর রয়েছে। অতএব মুয়াল্লিমের যত বেশী মুখস্থ বা ইয়াদ থাক, দেখে সবক শ্রবণ করার কোনো বিকল্প নেই। আমাদের উস্তাদ সাত সবক ও আমুখতা একসাথে একাধিক ছাত্র থেকে শ্রবণ করতেন, তবে সচরাচর দু'জনের অধিক ছাত্র থেকে সাত-সবক বা আমুখতা একসাথে শ্রবণ করতেন না।

সাপ্তাহিক সবিনা ও তার পদ্ধতি: সাধারণ হিফয খানার একটি বিশেষ প্রোগ্রাম হচ্ছে সাপ্তাহিক দাওর বা সবিনা, এতে হিফয খানার ছাত্ররা তাদের হিফযের পরিমাণ মোতাবেক ৫-১০ পারা, আবার কেউ ১৫ পারা পর্যন্ত দাওর করে, বা সবিনা পড়ে। আবার কারো সবিনার সংখ্যা ২-৩ পারাও হয়। সাধারণত দু'জন ছাত্র দ্বারা গ্রুপ করা হয়, একজন দাঁড়িয়ে মুখস্থ তিলাওয়াত করে দ্বিতীয়জন বসে তার তিলাওয়াত শ্রবণ করে, একপারা শেষে দ্বিতীয় শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করে প্রথম শিক্ষার্থী তার তিলাওয়াত শ্রবণ করে। যাদের সবিনার পারা বেশী বা যারা খতমের ছাত্র তারা সাধারণত বুধবার আমুখতা শুনিয়ে সবিনা আরম্ভ করে, আর যাদের পারা সংখ্যা কম তারা বৃহস্পতিবার সবক ও সাত-সবক শুনিয়ে সবিনা আরম্ভ করে, তাই বৃহস্পতিবার কেউ আমুখতা শুনায় না। খতমি ছাত্রদের সবিনা বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত দীর্ঘায়ত হত। পিছনের পড়া মুখস্থ রাখার জন্য সবিনা খুব কার্যকর।

লুকমা: লুকমা হিফয খানার একটি বিশেষ পরিভাষা। সাত-সবক, আমুখতা বা সবিনা শোনানোর সময় ছাত্রদের যে ভুল পরিলক্ষিত হয়, হোক সেটা জবর, জের, পেশ, সুকুন কিংবা তাশদীদ জাতীয়, কিংবা হরফ, শব্দ, শব্দ-পরিবর্তন বা মুশাবাহার আয়াত সংক্রান্ত। এ ভুলসমূহ তারা রঙিন কাগজের ছোট্ট একটি টুকরা মুখের লালা

দিয়ে ভিজিয়ে ভুলের জায়গার ঠিক উপরে লাগিয়ে দেয়, অতঃপর বারবার পড়ে তা শুধরে নেয়। যে কোনো ভুলকে এসব হিফয খানায় সাধারণত লুকমা বলা হয়। সবিনায় কয়টা লুকমা গেল, আমুখতায় কয়টা লুকমা গেল গণনা করা হয়।

হিফয খানার অন্যান্য প্রোগ্রাম: প্রচলিত হিফয খানায় সকাল বেলা নাস্তার পর, কিংবা দুপুর বেলা আমুখতা শেষে কিংবা এশার পর ছাত্রদের সবক মুখস্থ বা ইয়াদ শেষে কখনো তাজবিদ, হদর ও কিরাত মশক করানো হয়, কিংবা প্রসিদ্ধ কারী ও বিশুদ্ধ তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াত শুনানো হয়।

সামান্য সংস্কার: হিফয খানায় ছাত্র/ ছাত্রীগণ কুরআনুল কারিম মুখস্থ করবে, হিফয শেষে তারা মাদ্রাসা কিংবা স্কুলে ভর্তি হয়ে অন্যান্য শিক্ষা, যেমন বাংলা, আরবি ও ইংরেজি শিখবে এটাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু ৪-৫ বছর হিফয খানায় পড়ার পর ছাত্রদের জরুরি বাংলা ও অংক না-জানার বিষয়টি অনেক অভিভাবকের নিকট দৃষ্টিকটু ঠেকে, তাই অনেক হিফয খানায় নাস্তার পর থেকে ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত কিংবা আসর সালাতের পূর্বে এক ঘণ্টা বাংলা ও অংক পড়ানো হয়, কখনো ইংরেজি পড়ানো হয়।

সাধারণ হিফয খানার জন্য প্রস্তাব: সাধারণ হিফয খানায় যদি বাংলা, ইংরেজি ও অংক পড়ানোর পরিবর্তে কুরআন-বান্ধব আরবি ভাষা পড়ানো হয় তাহলে অনেক ভালো। হিফয খানার পরিবেশ

যদি এরাবিক বানানো হয়, তাতে ছাত্র/ ছাত্রীদের আদান-প্রদান ও কথোপকথন আরবিতে শিখানো হয় সেটিই উত্তম। এতে ছাত্র/ ছাত্রীরা কুরআনুল কারিমের ক্ষেত্রে অনেক ধাপ এগিয়ে যাবে। তবে দু'টি কারণে এ পদ্ধতিতে হিফয শাখা পরিচালনা করা খুব কঠিন: ক. আমাদের দেশে আরবি শিখানোর সঠিক পদ্ধতির অনুপস্থিতি, খ. যোগ্য শিক্ষকদের অবমূল্যায়ন। আমাদের দেশে অনেক মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কুরআনুল কারিমের শিক্ষকদের মূল্যায়ন করেন না, বা করতে জানেন না এটাই বাস্তবতা, তাই যোগ্য শিক্ষক তৈরি হয় না, কিংবা যোগ্য শিক্ষকদের যোগ্যতার বিকাশ ঘটে না।

তৃতীয় আরেকটা কারণ আমাদের দেশের কুরআনুল কারিমের শিক্ষকরা সাধারণত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়, তাই তাদের অনেকের ইচ্ছা থাকলেও নিজের অর্থের উপর দাড়িয়ে কুরআনুল কারিমের উত্তম সেবা দেওয়া সম্ভব হয় না। তারা পৃষ্ঠপোষকতার অভাব উপলব্ধি করেন গভীরভাবে। ধনবান মুসলিম কিংবা মুসলিম সরকার চাইলে এ ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। মুসলিম সরকার কর্তৃক এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে ধনী-গরীব সবাই তার দ্বারা উপকৃত হবে, কিন্তু ধনবান মুসলিমরা তার উদ্যোগ গ্রহণ করলে হয়তো গরীব মেধাবী ছাত্ররা তার থেকে উপকৃত হতে পারবে না।

হিফয খানার কতক পরিভাষার সংস্করণ:

আমরা কম-বেশী সবাই জানি ইংরেজদের পূর্বে ভারত উপমহাদেশের সরকারী ভাষা ছিল ফার্সি, তার সুবাদে নামায-রোজার ন্যায় অনেক পরিভাষা তৈরি হয়েছে ফার্সিতে, বর্তমান যেরূপ হচ্ছে ইংরেজির ক্ষেত্রে। হিফয খানার প্রায় সব-পরিভাষা তৈরি হয়েছে ফার্সিতে, অধ্যাব্দী তা বিদ্যমান। মুসলিম হিসেবে এরূপ করা আমাদের পক্ষে সমীচীন হয়নি। মাতৃভাষার পর আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে কুরআনের ভাষা আরবি। আমরা কোন যুক্তিতে সালাতকে নামাজ ও সিয়ামকে রোজা নামকরণ করলাম! তাই মাদ্রাসার হাফিয সাহেবগণ হিফয খানার পরিভাষাসমূহ ফার্সির পরিবর্তে আরবিতে পাল্টে দিন, এটা হিফযখানার শোভা, সৌন্দর্য ও কুরআনুল কারিমের ভাষার প্রতি তার অনুরাগের প্রমাণ।

কয়েকটি পরিভাষার বিকল্প আরবি নাম:

১. হিফয খানা: এতে বাক্যের গঠন ও শব্দ উভয় ফার্সি। 'হিফয' আরবি ও ফার্সি উভয় ভাষায় ব্যবহার হয়, তবে 'খানা' নিরেট ফার্সি শব্দ, অর্থ ঘর। বাক্যের গঠনও ফার্সি, আরবি গঠন অনুসারে 'খানাতুল হিফয' হয়। অতএব আমরা ফার্সি পরিভাষার পরিবর্তে আরবদের পরিভাষা 'হালাকাতুত তাহফিয', হালাকাতুল কুরআন, বা তাহফিযুল কুরআনুল কারীম মাদ্রাসা গ্রহণ করতে পারি।

২. সবক: সবকের পরিবর্তে দারস গ্রহণ করা ভালো। ৩. ‘আমুখতার’ পরিবর্তে মুরাজাআহ। ৪. সবিনার পরিবর্তে দাওর ও ৫. সাত-সবকের পরিবর্তে মুরাজাআহ মা‘আত দারস বা মুরাজাআতুত দুরুস ব্যবহার করা যায়। ৫. কুরআন শরীফের পরিবর্তে কুরআনুল কারীম, কুরআনুম মাজীদ, কুরআনুল হাকীম ইত্যাদি ব্যবহার করুন। অনুরূপ নামাজের পরিবর্তে সালাত, রোজার পরিবর্তে সিয়াম, আজরাইলের পরিবর্তে মালাকুল মউত ও ফেরেশতার পরিবর্তে মালায়েকা বলার দীক্ষা দিন।

সাধারণত হিফয খানা বলতে উপর্যুক্ত নিয়মে পরিচালিত উক্ত হিফয খানাকে বুঝানো হয়। পরবর্তীতে তাতে কিছু পরিবর্তন ও সংস্কার করে বিভিন্ন প্রকার হিফয খানা প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং তার জন্য বিকল্প কতক পরিভাষা ও নতুন নির্ঘণ্ট নির্ধারণ করা হয়। এক সময় আমাদের দেশে শুধু প্রচলিত মাদ্রাসায় কুরআনুল কারিম হিফয করানো হত, এখন তার পরিধি মাদ্রাসা পরিসর থেকে জেনারেল ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে, যার পরিচালক দীনদার ও ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হচ্ছে ‘লাইফ স্কুল’। যদিও নাম স্কুল এবং ইংলিশ মিডিয়াম, বস্তুত এটা ইসলাম চর্চার একটি কেন্দ্র। কিছু ত্রুটি, অপারগতা কিংবা সীমাবদ্ধতা থাকলেও

পরিচালকগণ সবাই চান ইসলাম বিজয়ী হোক। এ জন্যই তাদের নিরলস প্রচেষ্টা। নিম্নে দু'টি উদ্দেশ্যে লাইফ স্কুল কর্তৃক পরিচালিত 'হিফয শাখা'র নিয়ম-কানুন তুলে ধরছি: ১. লাইফ স্কুল কর্তৃক পরিচালিত হিফয শাখা থেকে হয়তো কেউ অনুপ্রাণিত হয়ে স্বীয় প্রতিষ্ঠানে হিফয শাখা চালু করবেন এবং তার নিয়ম-কানুন থেকে উপকৃত হবেন। ২. লাইফ স্কুল কর্তৃক পরিচালিত হিফয শাখার ত্রুটিগুলো পরিহার করে পরবর্তীতে কেউ আরো উন্নত ও ভালো একটি হিফয শাখা মুসলিম উম্মাহকে উপহার দিবেন।

পরিশিষ্ট

আমাদের দেশের হিফয খানার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে কম-বেশী দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা বিরাজ করে, যে কারণে তারা বিভিন্ন কুসংস্কার, বিদআত কখনো শিরকে পর্যন্ত লিপ্ত হয়। এ পরিশিষ্ট দ্বারা আমরা হিফয খানাসমূহে বিদ্যমান কুসংস্কার, বিদআত ও গর্হিত কর্ম-কাণ্ডসমূহ চিহ্নিত ও দূর করার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয়ত আমাদের দেশে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত সংক্রান্ত বেশ কিছু মাসআলার প্রচলন রয়েছে, কুরআন-হাদিসের মানদণ্ডে যার ভিত্তি খুব দুর্বল। এ পরিশিষ্ট দ্বারা সে সম্পর্কে আমরা দলিল ভিত্তিক সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

আশা করছি, কুরআনুল কারিমের হাফিয ও আল্লাহ তা'আলার কালামের ধারকগণ এ উদ্যোগ থেকে উপকৃত হবেন এবং হিফয খানাসমূহ ও নিজেদেরকে ভুল-ভ্রান্তি ও কুসংস্কার মুক্ত রাখবেন। আল্লাহ তাওফিক দানকারী।

অযু ব্যতীত কুরআনুল কারিম স্পর্শ করার বিধান

অধিকাংশ আলেমের মতে অযু ব্যতীত মুসহাফ/ কুরআনুল কারিম স্পর্শ করা বৈধ নয়। ইমাম আবু হানিফা[1], মালিক[2], শাফেয়ী[3], আহমদ ইবনে হাম্বল[4] ও শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ[5] প্রমুখগণ এ মত পোষণ করেছেন। সাহাবিদের ফতোয়াও তাই ছিল। দলিল হিসেবে তারা পেশ বলেন:

১. ইয়ামানের গভর্নর আমর ইবনে হাযম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখে পাঠান:

«أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».

"পবিত্র সত্তা ব্যতীত কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না"।[6]

"হাদিসটি মুত্তাসিল ও মুরসাল উভয় সনদে বর্ণিত, ইমাম মালিক মুরসাল এবং ইমাম নাসায়ী ও ইবনে হিব্বান রহ. মুত্তাসিল বর্ণনা

---

[1] মারাকিল ফালাহ:(পৃ.৬০), বাদায়েউস-সানায়ে ফি-তারতীবিশ-শারায়ে: (১/৩৩)

[2] আশ-শারহুস সাগির: (১/১৪৯), মাওয়াহিবুল জালিল ফি শারহি মুখতাসারিল খালিল: (১/৩০৩)

[3] মুগনিল মুহতাজ: (১/৩৬), আল-মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব: (২/৬৫)

[4] আল-ইনসাফ ফি মারিফাতির রাজিহ মিনাল খিলাফ, লিল মুরদাওয়ি: (১/২২৩), শাহরু মুনতাহাল ইরাদাত: (১/৭৭)

[5] মাজমুউল ফতোয়া: (২১/২৬৬)

[6] আল-মুয়াত্তা: (৫৩৪), আবুদাউদ ফিল মারাসিল: (৯৩)

করেছেন, প্রকৃতপক্ষে হাদিসটি মুরসাল, মুত্তাসিল নয়। ইমাম আহমদ রহ. বলেন: আশা করছি হাদিসটি সহি। আসরাম বলেন: ইমাম আহমদ হাদিসটি দলিল হিসেবে পেশ করেছেন"।[1]

ইবনে হাজার রহ. ইবনে তাইমিয়ার কথা সংক্ষেপ করে বলেন: এক দল ইমাম হাদিসটি সহি বলেছেন, সনদের বিবেচনায় নয়, প্রসিদ্ধির বিবেচনায়"।[2] তারা দ্বিতীয় দলিল হিসেব পেশ করেন কুরআনুল কারিমের নিম্নোক্ত আয়াত:

২. আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّهُۥ لَقُرۡءَانٞ كَرِيمٞ ۝٧٧ فِي كِتَٰبٖ مَّكۡنُونٖ ۝٧٨ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ ۝٧٩ ﴾ [الواقعة: ٧٧، ٧٩]

"নিশ্চয় এটি মহিমান্বিত কুরআন, যা সুরক্ষিত কিতাবে রয়েছে, কেউ তা স্পর্শ করবে না পবিত্রগণ ছাড়া"।[3]

দলিল হিসেবে এ আয়াত পেশ করা দুরস্ত নয়, কারণ পূর্বাপর বিষয় থেকে স্পষ্ট যে, পবিত্রগণ ব্যতীত যে কিতাব কেউ স্পর্শ করে না তা মাকনুন কিতাবে বিদ্যমান। মাকনুন কিতাব দ্বারা

---

[1] আত-তিবইয়ান ফি আকসামিল কুরআন: (পৃ.২২৯), আত-তালখিসুল হাবির: (৪/৫৮)

[2] আত-তালখিসুল হাবির: (৪/৫৮)

[3] সূরা ওয়াকিয়াহ: (৭৭-৭৯)

উদ্দেশ্য লাওহে মাহফুয"।[1] আর لَا يَمَسُّهُ এর সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য লাওহে মাহফুয, কারণ এটাই তার নিকটতম বিশেষ্য। অর্থাৎ লাওহে মাহফুযে বিদ্যমান কুরআনুল কারিমকে পবিত্র সত্ত্বা মালায়েকা বা ফেরেশতাদের ব্যতীত কেউ স্পর্শ করে না। অতএব দুনিয়ার জমিনে বিদ্যমান কুরআনুল কারিম স্পর্শ করার জন্য অযু শর্ত এ আয়াত তার দলিল নয়।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন: "শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আসমানে বিদ্যমান সহিফাগুলো যখন পবিত্র সত্তা ব্যতীত কেউ স্পর্শ করে না, আমাদের হাতে বিদ্যমান সহিফাগুলো আমরা পবিত্র অবস্থা ব্যতীত স্পর্শ করব না, এটাই সতর্কতা, সাবধানতা ও মালায়েকাদের সাথে সামঞ্জস্যতা। বস্তুত এ আয়াত থেকে হাদিসটি নিঃসৃত হয়"।[2] অযু ব্যতীত কুরআনুল কারিম স্পর্শ করা যাবে না পক্ষে তারা তৃতীয় দলিল পেশ করেন সাহাবিদের আমল।

৩. ইসহাক ইবনে রাহওয়েহ বর্ণনা করেন, "নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ অযুসহ কুরআনুল কারিম স্পর্শ করতেন"।[3] শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ

---

[1] আত-তিবইয়ান ফি আকসামিল কুরআন: (পৃ.২২৯)

[2] আত-তিবইয়ান ফি আকসামিল কুরআন: (পৃ.২২৯)

[3] মাসায়েলুল ইমাম আহমদ ও ইসহাক ইবনে রাহওয়েহ: (২/৩৪৫)

বলেন: সালমান ফারসি, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও অন্যান্য সাহাবি কুরআন স্পর্শ করার জন্য অযু শর্ত করতেন, কোনো সাহাবি তাদের বিরোধিতা করেননি"।[1]

কতক আলেম বলেন, কুরআনুল কারিম স্পর্শ করার জন্য অযু করা মোস্তাহাব, জরুরি নয়। এটা জাহেরিয়াদের মাযহাব, ইবনে হাযম রহ. এ মতকে শক্তিশালী করেছেন।[2] তাদের দলিল:

১. তিলাওয়াত করার জন্য মুসহাফ শরীফ স্পর্শ করা সাওয়াবের কাজ, দলিল ব্যতীত তাতে অযু শর্ত করা যাবে না, কারণ তখন যাদের অযু নেই তারা এ সাওয়াব থেকে মাহরূম হবে। আর প্রমাণিত যে, কুরআন ও সহি হাদিসে তার পক্ষে কোনো দলিল নেই, তাই কুরআন স্পর্শ করার জন্য অযু শর্ত করা যথাযথ নয়।[3]

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসরার প্রধান হিরাকলকে নিম্নোক্ত আয়াতসহ পত্র লিখেন:

﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ كَلِمَةٖ سَوَآءِۢ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أَلَّا نَعۡبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشۡرِكَ بِهِۦ شَيۡـٔٗا وَلَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِۚ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُولُواْ ٱشۡهَدُواْ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ ٦٤﴾ [ال عمران: ٦٤]

---

[1] মাজমুইল ফতোয়া: (২১/২৬৬)

[2] আল-মুহাল্লাহ: (১/৯৫)

[3] আল-মুহাল্লা বিল আসার: (১/৯৫)

‘হে কিতাবিগণ, তোমরা এমন কথার দিকে আস, যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করব না। আর তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করব না এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া রব হিসাবে গ্রহণ করব না। তারপর যদি তারা বিমুখ হয় তবে বল, ‘তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম”।[1]

ইবনে হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, খৃস্টানদের নিকট উক্ত আয়াতসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র প্রেরণ করা প্রমাণ করে অযু ও ইমান ব্যতীত কুরআনুল কারিম স্পর্শ করা বৈধ।[2]

উত্তর: এ হাদিস সম্পর্কে জমহুর আলেমগণ বলেন, পত্রের আয়াত কুরআনুল কারিমের হুকুম রাখে না, তা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যের অংশ, অথবা তাফসির গ্রন্থে বিদ্যমান আয়াতের মত একটি আয়াত, যা অযু ব্যতীত স্পর্শ করা বৈধ।[3]

৩. মুসলিমরা তাদের বাচ্চাদের অযু ব্যতীত কুরআনুল কারিম স্পর্শ করার অনুমতি দিয়ে আসছেন, যদি অযু ব্যতীত কুরআনুল

---

[1] সূরা আলে-ইমরান: (৬৪)

[2] আল-মুহাল্লা বিল আসার: (১/৯৮)

[3] আল-মুগনি লি ইবনে কুদামাহ: (১/১০৯), নাইলুল আওতার: (১/২৬১)

কারিম স্পর্শ করা হারাম হত তারা কখনো তার অনুমতি প্রদান করতেন না।

উত্তর: এ যুক্তি সম্পর্কে জমহুর বলেন, প্রয়োজনের খাতিরে তারা অনুমতি প্রদান করেন, অযু ব্যতীত বাচ্চাদের কুরআন পড়া নিষেধ করা হলে তারা কুরআন থেকে বিমুখ হবে, তাই মুসলিমদের এ আমল দলিল হিসেবে পেশ করা যৌক্তিক নয়।

শায়খ উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ প্রথম বলতেন অযু ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করা বৈধ, পরবর্তীতে তিনি এ ফতোয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তার প্রথম বক্তব্য ছিল:

«أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».

"মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না"।[1] তিনি 'তাহির' শব্দের অর্থ বলতেন মুমিন। পরবর্তীতে তিনি বলেন طاهرٌ শব্দের অর্থ মুমিন নয়, বরং পবিত্র ব্যক্তি, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো মুমিন ব্যক্তিকে 'তাহির' বলেননি। দ্বিতীয়ত অযুর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ ٦﴾ [المائدة: ٦]

---

[1] আল-মুয়াত্তা: (৫৩৪), আবুদাউদ ফিল মারাসিল: (৯৩)

“আল্লাহ তোমাদের উপর কঠিন করতে চান না, তবে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান”।[1] অতএব ‘তাহির’ অর্থ পবিত্র, তাই কোনো ব্যক্তি পবিত্র অবস্থা ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করবে না, তবে রোমাল, অথবা হাত মোজা অথবা মিসওয়াক দ্বারা কুরআনুল কারিমের পৃষ্ঠা উল্টানো বৈধ”। এটাই শায়খের সর্বশেষ ফতোয়া, তিনি বলেন:

«فالذي تَقَرَّرَ عندي أخيراً: أنَّه لا يجوز مَسُّ المصْحَفِ إلا بِوُضُوء».

“সর্বশেষ আমার নিকট প্রমাণিত হয়েছে যে, অযু ব্যতীত মুসহাফ স্পর্শ করা বৈধ নয়”।[2]

কুরআন স্পর্শ করার জন্য অযু শর্ত ফতোয়াই সঠিক। বিশেষ করে পূর্বাপর সকল মনীষী তার উপর আমল করেছেন। ইবনে হাযম রাহিমাহুল্লার দলিল খুব দুর্বল, তবে বাচ্চাদেরকে অযুর জন্য বাধ্য করা, কিংবা অযু না থাকার অজুহাতে বড়দের কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত থেকে বিরত খাতা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, সবাই বলেছেন আড়াল দ্বারা মুসহাফ শরীফ স্পর্শ করা বৈধ। অতএব যত বেশী সম্ভব কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করুন, সর্বাবস্থায় অযুর হালতে থাকার চেষ্টা করুন। যদি অযু না থাকে, কিংবা অযু করা সময় সাপেক্ষ বা কষ্টকর হয়, তাহলে আড়ালসহ ধরে

---

[1] সূরা মায়েদাহ: (৬)

[2] আশ-শারহুল মুমতি আলা-জাদিল মুসতাকনি: দারস নং: (৫৬)

কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করুন। অসতর্কতা কিংবা বেখেয়ালে কুরআনুল কারিমের সাথে শরীরের কোনো অংশের স্পর্শ হলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চান, শরীরের সাথে কুরআনুল কারিমের স্পর্শ হবে আশঙ্কায় তবুও দেখে তিলাওয়াত করা ছাড়বেন না। কারণ, স্পর্শ হবে আশঙ্কায় তিলাওয়াত ত্যাগ করার তুলনায় তিলাওয়াতের সময় স্পর্শের পর তওবা করা অনেক ভালো। বিশেষভাবে যেহেতু এতে দ্বিমত রয়েছে, তাই সামান্য হলেও অযু করার বিষয়টি হালকা হয়।

উল্লেখ্য, কাপড় বা শরীরের কোনো অংশ নাপাক হলে অযু নষ্ট হয় না, মুসলিম বোনেরা বিষয়টি ভালোভাবে মনে রাখুন, অতএব ছোট বাচ্চা যদি আপনার শরীর বা কাপড়ে পেশাব করে, কিংবা তার পায়খানার দাগ আপনার কাপড়ে দেখা যায়, তাহলে পরবর্তী সময়ের জন্য তিলাওয়াত ত্যাগ করবেন না, কারণ তখন আপনার সুযোগ নাও হতে পারে। অনুরূপ নাপাক বিছানা কিংবা নাপাক চেয়ারে বসে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা সমস্যা নয়। এ কথাও ঠিক যে, কুরআন তিলাওয়াতকারী আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলে, তাই তার কাপড়, শরীর ও জায়গা পাক হওয়া তিলাওয়াত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব। আল্লাহ ভালো জানেন।

ঋতুমতী ও নিফাসের নারীদের কুরআন পড়ার বিধান

ঋতুমতী ও 'নিফাসে'র[1] নারীদের কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা প্রসঙ্গে আলেমগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তাদের জন্য কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা বৈধ। বিশেষভাবে যদি ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা হয় অথবা পরীক্ষার জন্য বারবার পড়ার প্রয়োজন হয় কিংবা ঝাড়-ফুঁক ও সকাল-সন্ধ্যার যিকর আদায় করার সময় হয়। এসব মুহূর্তে তারা স্পর্শ করা ব্যতীত কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করবে, একান্ত প্রয়োজন হলে কাপড়ের টুকরো, রোমাল বা হাত মোজা ইত্যাদি আড়াল দ্বারা স্পর্শ করবে, কারণ পবিত্র সত্তা ব্যতীত কারো পক্ষে কুরআনুল কারিম স্পর্শ করা বৈধ নয়।

ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ ও শাওকানি রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখগণ এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের দলিল:

১. আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন, তিলাওয়াতকারীর প্রশংসা করেছেন এবং তার জন্য

---

[1] 'হিফাস' অর্থ প্রসূতি অবস্থা। সন্তান প্রসবের জন্য প্রসূতি নারী থেকে যে রক্ত বের হয় তার শুরু থেকে বন্দ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মেয়াদকে নিফাস বলা হয়। 'নিফাসে'র মেয়াদ চল্লিশ দিন অতিক্রম করলে তার পরবর্তী অবস্থাকে 'ইস্তেহাদাহ' বলা হয়, তখন যথারীতি সালাত-সিয়াম আদায় করা ফরয।

অনেক সাওয়াবের ওয়াদা করেছেন, তাই প্রমাণিত দলিল ব্যতীত কাউকে কুরআন তিলাওয়াত থেকে নিষেধ করা যাবে না। ঋতুমতী নারীকেও নয়, কারণ তাকে নিষেধ করার পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোনো দলিল নেই।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন: "ঋতুমতী নারীকে কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত রাখার পক্ষে সহি ও স্পষ্ট কোনো দলিল নেই"। তিনি আরো বলেন: "সবাই জানে যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নারীদের মাসিক হত, কিন্তু তাদেরকে তিনি কুরআন তিলাওয়াত থেকে নিষেধ করেননি, যেমন নিষেধ করেননি দোয়া ও সকাল-সন্ধ্যার যিকর থেকে। যদি নিষেধ করা হত অবশ্যই সাহাবিদের মাঝে তার চর্চা থাকত এবং আমাদের পর্যন্ত তা পৌঁছাত"।[1]

২. বিদায় হজের সফরে যখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার মাসিক হয়, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন:

«افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»

"হাজিরা যা করে তুমিও তাই কর, তবে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ কর না, যতক্ষণ না তুমি পবিত্র হও"।[2]

---

[1] মাজমুউল ফতোয়া: (২৬/১৯১)

[2] মুসলিম: (২১২২)

তিনি একই নির্দেশ প্রদান করেন আসমা বিনতে উমাইসকে[1], যখন সে বিদায় হজের রাস্তায় (মিকাতে) মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে প্রসব করেছিল।[2] কারণ তাওয়াফ সালাতের ন্যায়, তার জন্য সালাত পড়া নিষেধ, তাই তাওয়াফ করাও নিষেধ; কিন্তু কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা নিষেধ নয়, যদি তাতে কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকত অবশ্যই তিনি বিদায় হজ কিংবা তার পরবর্তী সময়ে আয়েশা ও অন্যান্য নারীদের নিষেধ করতেন, কারণ প্রত্যেক ঘরে হায়েদ ও নিফাসের নারী থাকা স্বাভাবিক, তাই তার নীরবতা প্রমাণ করে ঋতুমতী নারীর জন্য কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা বৈধ।

সৌদি আরবের উলামা পরিষদের আলেমগণ বলেন: “কুরআন ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা হলে ঋতুমতী নারীর জন্য স্পর্শ ব্যতীত মুখস্থ তিলাওয়াত করা বৈধ”।[3] শায়খ ইবনে বায রহ. অনুরূপ ফতোয়া প্রদান করেছেন।[4] শায়খ ইবনে উসাইমিন রহ. বলেন:

---

[1] আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর স্ত্রী।

[2] দেখুন: মাজমু ফতোয়া ও মাকালাত মুতানাউওয়্যিআহ, ৪র্থ খণ্ড।

[3] ফতোয়াল লাজনায়ে দায়েমাহ: (৪/২৩২)

[4] মজমু ফতোয়া ইবনে বাজ: (৬/৩৬০)

"ঋতুমতী নারী তাফসীর বা অন্যান্য গ্রন্থ থেকে কুরআন তিলাওয়াত করলে অযু করা জরুরি নয়"।[1]

অধিকাংশ আহলে-ইলম বলেন, মাসিকের সময় নারীর জন্য কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা হারাম, যতক্ষণ না সে পবিত্র হয়। তাদের নিকট ঋতুমতী সকল নারী এ বিধানের অধীন, তবে যিকর ও দোয়ার নিয়তে যা পড়া হয়, শুধু তার অনুমতি প্রদান করেন তারা, যেমন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন, রাবান্না আতিনা... ইত্যাদি। তাদের দলিল নিম্নরূপ:

১. প্রথম দলিল কিয়াস: 'হায়েদ'[2] ও নিফাসের নারীরা জুনুবি তথা অপবিত্র শরীর বিশিষ্ট ব্যক্তির মত, জুনুবি ব্যক্তি যেরূপ কুরআন পড়ে না তারাও পড়বে না। কারণ জুনুবি ব্যক্তির ন্যায় তাদের শরীর নাপাক, তাদের উপর গোসল ফরয যেরূপ জুনুবি ব্যক্তির উপর গোসল ফরয। জুনুবি ব্যক্তি সম্পর্কে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

---

[1] ফতোয়া নুরুন আলাদ-দারব: (২৭/১২৩)

[2] নারীর গর্ভাশয় থেকে রোগ ও আঘাত ব্যতীত প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময় যে রক্ত বের হয় আরবিতে তাকে 'হায়েদ' বলা হয়। সাধারণত নয় থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যবর্তী সময় নারীদের হায়েদ আসে এবং গর্ভকালীন অবস্থায় বন্ধ থাকে। হায়েদকে বাংলায় ঋতুস্রাব, রজঃস্রাব ও মাসিক ইত্যাদি বলা হয়।

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة»

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন, কিন্তু জানাবত ব্যতীত কোনো বস্তু তাকে কুরআন থেকে বিরত রাখত না”।[1]

এ হাদিস প্রমাণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাবত অবস্থায় কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করতেন না, কারণ তার উপর গোসল ফরয ছিল, অনুরূপ হায়েদ ও নিফাসের নারীরা কুরআন তিলাওয়াত করবে না, কারণ তাদের উপর গোসল ফরয।

উত্তর: এ কিয়াস সঠিক নয়, কারণ হায়েদ ও নিফাসের নারী এবং জুনুবি ব্যক্তির অবস্থা এক নয়। হায়েদ ও নিফাসের নারীদের ঋতু দীর্ঘ মেয়াদী এবং তারা তাতে অপারগ; পক্ষান্তরে জুনুবি ব্যক্তির নাপাক স্বল্প মেয়াদী এবং তারা তাতে ইচ্ছাধীন; অতএব জুনুবি ব্যক্তির সাথে হায়েদ ও নিফাসের নারীদের কিয়াস বা তুলনা করা যথাযথ নয়। তাই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত জুনুবি ব্যক্তির নিষেধাজ্ঞা

---

[1] আবু দাউদ: (১/২৮১), তিরমিযি: (১৪৬), নাসায়ি: (১/১৪৪), ইবনে মাজাহ: (১/২০৭), আহমদ: (১/৮৪), ইবনে খুজাইমাহ: (১/১০৪), ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটি হাসান ও সহি বলেছেন। ইবনে হাজার রহ. বলেন, বস্তুত হাদিসটি হাসান, দলিল হিসেবে পেশ করার উপযুক্ত।

তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, তার উপর কিয়াস করে হায়েদ ও নিফাসের নারীদের উপর কুরআন তিলাওয়াত করার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে না।

২. দ্বিতীয় দলিল দুর্বল হাদিস: ইমাম আবু-দাউদ রাহিমাহুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ».

"ঋতুমতী নারী ও জুনুবি ব্যক্তি কুরআনুল কারিমের কোনো অংশ পড়বে না"।[1]

আহলে-ইলমের নিকট হাদিসটি দুর্বল, কারণ তার সনদে ইবরাহীম ইবনে আইয়াশ রয়েছেন। হাদিস বিশারদগণ তার সম্পর্কে বলেন, হিজাযিদের থেকে বর্ণনা করা তার হাদিসগুলো দুর্বল, আর এ হাদিস সে হিজাযিদের থেকে বর্ণনা করেছে অতএব এটা দুর্বল। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন: "হাদিস বিশারদদের ঐক্যমত্যে উক্ত হাদিস দুর্বল"।[2]

---

[1] তিরমিযি: (১৩১)

[2] মাজমুউল ফতোয়া: (২১/৪৬০), আরো দেখুন: নাসবুর রায়াহ: (১/১৯৫), আত-তালখিসুল হাবির: (১/১৮৩)

ঋতুমতী ও নিফাসের নারীদের জন্য কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা বৈধ এ অভিমত সঠিক, কারণ তাদের দলিল সহি ও স্পষ্ট। আল্লাহ ভালো জানেন।

জুনুবি ব্যক্তির কুরআন তিলাওয়াত করার বিধান

কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করার জন্য জানাবত[1] থেকে পাক হওয়া জরুরি। আলি ইবনে আবি তালিব রা. বলেন:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الْخَلَاءَ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يَحْجُبُهُ وَرُبَّمَا قَالَ لَا يَحْجُزُهُ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا الْجَنَابَةُ».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাথরুম যেতেন ও প্রয়োজন সারতেন, অতঃপর বের হতেন, আমাদের সাথে রুটি-গোস্ত খেতেন এবং কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করতেন, তাকে কুরআন তিলাওয়াত থেকে কোনো বস্তু বিরত রাখত না একমাত্র জানাবত ব্যতীত”।[2]

---

[1] স্ত্রীসহবাস, স্বপ্নদোষ কিংবা উত্তেজনার সাথে বীর্জপাত ঘটার পরবর্তী নাপাকি অবস্থাকে জানাবত বলা হয়, জানাবত অবস্থায় কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা বৈধ নয়।

[2] ইবনে মাজাহ: (৫৯৪)

হাদিসের শব্দ ইবনে মাজাহ থেকে নেওয়া, অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন নাসায়ী[1], আবু দাউদ[2] ও আহমদ[3] প্রমুখগণ। কতক মুহাদ্দিস হাদিসটি দুর্বল বলেছেন| ইবনে হাজার রহ. বলেন: "হাদিসটি হাসান ও দলিল যোগ্য"| এ কথাই ঠিক।

ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন, অধিকাংশ সাহাবি, তাবেয়ি ও তাদের পরবর্তী মনীষীদের আমল হচ্ছে জুনুবি অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত না করা, যেমন সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারাক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক প্রমুখগণ। তারা বলেন জুনুবি ব্যক্তির পক্ষে কুরআনের কোনো অংশ পড়া বৈধ নয়, তবে শব্দ কিংবা আয়াতের ছোট অংশ পড়া বৈধ। নিষেধাজ্ঞার হাদিসগুলো যদিও দুর্বল, তবে একটি দ্বারা অপরটি শক্তিশালী হয়।

সৌদি আরবের ফতোয়া বোর্ডের ফতোয়া

অধিকাংশ আহলে-ইলমের মতে জুনুবি ব্যক্তির জন্য কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা বৈধ নয়, যদিও মুখস্থ পড়ে ও স্পর্শ বিহীন পড়ে। কারণ আলি রা. বর্ণনা করেন:

«أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة».

---

[1] নাসায়ি: (১/১৬৯)

[2] আবু দাউদ: (১/৯১), হাদিস নং: (২২৯)

[3] আহমদ: (৬৩৯), (৮৪০) ও (১০১১)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাবত ব্যতীত কোনো বস্তু কুরআন থেকে বিরত রাখত না"।[1] হাফিয ইবনে হাজার রহ. বলেন: এ হাদিসের সনদ হাসান। যদি সে পানি না পায়, কিংবা অসুস্থতার কারণে পানি ব্যবহারে অক্ষম হয়, তাহলে তায়াম্মুম করবে। আল্লাহ তাওফিক দাতা।[2]

কুরআনুল কারিমের কসম করার বিধান

কোনো বস্তু বা সত্তার কসম করার অর্থ ঐ বস্তু বা সত্তাকে বিশেষ সম্মান প্রদান করা, যার হকদার একমাত্র আল্লাহ 'তা'আলা। অতএব যে কোনো বস্তু বা সত্তার কসম করল সে আল্লাহর হক ও প্রাপ্য সম্মানে গায়রুল্লাহকে অংশীদার করল। তাই এ জাতীয় কসম করা শিরক। পীরের নামে যে কসম করল, সে পীরকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করল; নবী-অলি-বুজুর্গের নামে যে কসম করল সে তাদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করল। ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

---

[1] আহমদ: (১/৮৪), (১/১২৪), (২২৯), তিরমিযি ফিল জামি: (১৪৬), ইমাম তিরমিযি হাদিসটি হাসান বলেছেন। নাসায়ি ফিল মুজতাবা: (১/১৪৪), ইবনে মাজাহ: (৫৯৬)

[2] আল-লাজনাহ দায়েমাহ লিল বুহুসিল ইলমিয়াহ ওয়াল ইফতা।

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ».

“যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে কসম করল সে কুফরি করল, অথবা শিরক করল”।[1] ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

«لأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا».

“আমি আল্লাহ ব্যতীত কারো নামে সত্য কসম করব অপেক্ষা, আল্লাহর নামে আমি মিথ্যা কসম করব আমার নিকট অধিক প্রিয়”।[2] আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম করা কবিরা গুনাহ, কিন্তু গায়রুল্লাহর নামে সত্য কসম করা শিরক। শিরক কবিরা গুনা থেকেও বড়, হোক তা ছোট শিরক। ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ».

“তোমরা তোমাদের পিতাদের নামে কসম কর না। যে আল্লাহর নামে কসম করে তার উচিত সত্য বলা, যার জন্য আল্লাহর নামে

---

[1] তিরমিযি: (১৫৩৫), ইমাম তিরমিযি হাদসটি হাসান বলেছেন। আবু দাউদ: (৩২৫১), আলবানি রহ. সহি তিরমিযিতে হাদিসটি সহি বলেছেন।

[2] মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক: (১৫৯২৯)

কসম করা হল তার উচিত সন্তুষ্টি প্রকাশ করা, যে আল্লাহর নামে সন্তুষ্টি প্রকাশ করল না, তার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক নেই"।[1]

কুরআনুল কারিম আল্লাহ আ'তালার সিফাৎ বা বিশেষণ, তাই কুরআনুল কারিম কিংবা তার কোনো আয়াতের কসম করার অর্থ আল্লাহ আ'তালার সিফাতের কসম করা, অতএব তা বৈধ। এ জন্য কুরআন উপস্থিত করা জরুরি নয়। ইবনুল আরাবি রহ. বলেন, "কুরআনুল কারিমের উপর হাত রেখে কসম করা বিদআত, কোনো সাহাবী এরূপ করেননি"।[2]

কুরআনুল কারিমের কসম দ্বারা কুরআনের কাগজ, কালি ও বর্ণমালার কসম করা বৈধ নয়, বরং শিরকের অন্তর্ভুক্ত; কারণ, কাগজ-কালি ও আরবি বর্ণমালা মখলুক। আহলে-ইলমগণ বলেন, কুরআনুল কারিমের কসম না করাই ভালো, কারণ তাতে আল্লাহর কালামের সাথে কাগজ-কালি এবং আরবি বর্ণমালাও রয়েছে। তাই কুরআনুল কারিমের কসমে কাগজ-কালির কসম শামিল হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হয়, অতএব এ জাতীয় কসম থেকে বিরত থাকা উত্তম।

---

[1] ইবনে মাজাহ: (২১০১), সনদটি হাসান।

[2] তাফসিরুল কুরতুবি: (৬/৩৫৪)

কসম গ্রহীতার নিয়ত গ্রহণযোগ্য: মান্নতের ক্ষেত্রে মান্নতকারীর নিয়ত গ্রহণযোগ্য, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

"সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল, আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে যা সে নিয়ত করেছে"।[1] কিন্তু কসমের ক্ষেত্রে কসম গ্রহীতা ও বিচারকের নিয়ত গ্রহণযোগ্য।[2] আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ». وفي رواية: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ».

"তোমার সাথী যার উপর তোমাকে সত্যারোপ করছে তার উপর তোমার কসম সংগঠিত হবে"। অপর বর্ণনায় আছে, "কসম গ্রহীতার নিয়তের উপর কসম সংগঠিত হয়"।[3]

অতএব কসমকারী যদি কসম গ্রহীতার বিপরীত নিয়ত করে তার নিয়ত গ্রহণযোগ্য নয়; তবে মজলুম হলে তার নিয়ত গ্রহণযোগ্য।

---

[1] বুখারি: (১)

[2] কসমের সাথে যদি কারো হক সংশ্লিষ্ট না থাকে, তাহলে কসমকারীর নিয়ত গ্রহণযোগ্য।

[3] মুসলিম: (১৬৫৪)

কসম করার সময় কোনো নিয়ত না থাকলে কসমের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী বস্তু কসমের নিয়ত হিসেবে গণ্য হবে।

শায়খ উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহু বলেন: "কুরআনুল কারিমের কসম করার রীতি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে, কিংবা তার সাহাবীদের যুগে, এমন কি কুরআন লিপিবদ্ধ হওয়ার পরও ছিল না। তাই কসম করার প্রয়োজন হলে আল্লাহর নামে কসম করাই শ্রেয়"।[1] নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ».

"যার কসম করতে হয়, সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে, অথবা চুপ থাকে"।[2]

কসম ভঙ্গ কাফফারা কাফফারা:

কসম করে কেউ যদি কসম থেকে ফিরে আসতে চায়, অথবা কসম ভঙ্গতে চায়, তাহলে কসমের কাফফারা দেওয়া জরুরি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ ٨٩﴾ [المائدة: ٨٩]

---

[1] ফতোয়া নুরুন আলাদ-দারব।

[2] বুখারি: (২৬৭৯)

“সুতরাং এর কাফফারা হল দশজন মিসকীনকে খাবার দান করা- মধ্যম ধরণের খাবার, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে খাইয়ে থাক, অথবা তাদের বস্ত্র দান করা, কিংবা একজন দাস-দাসী মুক্ত করা। আর যে সামর্থ্য রাখে না, তবে তিন দিন সিয়াম পালন করা। এটা তোমাদের কসমের কাফফারা-যদি তোমরা কসম কর, আর তোমরা তোমাদের কসম হেফাজত কর”।[1]

খাবার দেওয়া, অথবা পরিধেয় বস্ত্র দান করা, অথবা একজন মুমিন গোলাম মুক্ত করার মাঝে সিরিয়াল রক্ষা করা জরুরি নয়, যে কোনো একটি দ্বারা কাফফারা আদায় হয়। যদি উক্ত প্রকারের কাফফারা আদায়ে সামর্থ্য না থাকে তাহলে তিন দিন সিয়াম রাখবে।

খারাপ কসম ভঙ্গ জরুরি: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«وَإِنِّي وَاللَّهِ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي».

“আল্লাহর শপথ, কোনো কসম করে যদি তার বিপরীত আমি কল্যাণ দেখি, –ইনশাআল্লাহ- অবশ্যই আমি আমার কসমের

---

[1] সূরা মায়েদাহ: (৮৯)

কাফফারা দেই এবং ভালো কাজটি করি; অথবা ভালো কাজটি করি পরে আমার কসমের কাফফারা দেই"।[1] ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ)). وفي رواية: ((فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

"যে কসম করল অতঃপর তার বিপরীত কল্যাণ দেখল, সে যেন তার কসমের কাফফারা দেয় এবং কাজটি করে"।[2] অপর বর্ণনায় আছে, "সে যেন তার কসমের কাফফারা দেয় এবং যা কল্যাণ তাই করে"।[3]

কুরআনুল কারিমের পুরনো পৃষ্ঠা পোড়ানোর বিধান

কুরআনুল কারিম যদি পুরনো হয়, তার পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে যায় ও ব্যবহার অনুপযোগী হয়, তাহলে এমন জায়গায় রাখা যাবে না, যেখানে অসম্মানের সম্মুখীন হয়, ময়লা-আবর্জনায় পতিত হয়, মানুষ বা জীব-জন্তু দ্বারা পিষ্ট হয়। যদি বাঁধাই করে পাঠ উপযোগী করা সম্ভব হয়, তাহলে পরিত্যক্ত না রেখে ব্যবহার করা শ্রেয়। প্রকাশক, মুদ্রাক্ষরিক বা কারো অবহেলা ও ভুলের কারণে

---

[1] বুখারি: (৬৬২৩)

[2] মুসলিম: (১৬৫১)

[3] মুসলিম: (১৬৫১), মুয়াত্তা ইমাম মালিক: (১০৩৪)

কুরআনুল কারিম যদি ভুল মুদ্রিত হয়, তাহলে সংশোধন করে পাঠ উপযোগী করা জরুরি। পাঠ-উপযোগী করা সম্ভব না হলে অসম্মান ও বিকৃতি থেকে সুরক্ষার জন্য মুসহাফগুলো পোড়ানো কিংবা নিরাপদ স্থানে দাফন করা জরুরি। শায়খ সালেহ আল-ফাওযান বলেন: "ব্যবহার অনুপযোগী কুরআন পোড়ানো ও দাফন করা উভয় পদ্ধতি সাহাবিদের থেকে প্রমাণিত"।[1]

পুরনো কুরআন দাফন করার সিদ্ধান্ত হলে পবিত্র স্থানে দাফন করবে, ভবিষ্যতে যেখানে অপমানের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অনেক সালফে সালেহীন রহ. তাদের পুরনো কুরআন মসজিদে দাফন করেছেন। ইমাম আহমদ রহ. বলেন: "আবুল জাওযা রাহিমাহুল্লাহর একটি কুরআন পুরনো হয়ে গিয়েছিল, অতঃপর মসজিদে গর্ত করা হয়, তিনি সেখানে তা দাফন করেন"।[2] অতএব মসজিদ বা মসজিদের জায়গায় পুরনো কুরআন দাফন করা কোনো সমস্যা নয়।

পুরনো কুরআন সুরক্ষার দ্বিতীয় পদ্ধতি পোড়ানো। ইমাম বুখারি রহ. বর্ণনা করেন:

«فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَبْدَ

---

[1] মাজমু ফতোয়া, শায়খ সালেহ আল-ফাউযান: (১/১২৭)

[2] কাশশাফুল কিনা আনিল ইকনা: (১/১৩৭)

اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ ...وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا ، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنْ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ».

"... অতঃপর উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট বলে পাঠান, আমার নিকট মুসহাফগুলো পাঠিয়ে দিন, আমরা তা একাধিক মুসহাফে নকল করে আপনার নিকট ফেরত পাঠাব, ফলে তিনি উসমানের নিকট তা পাঠিয়ে দেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু জায়েদ ইবনে সাবেত, আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের, সায়িদ ইবনে আস ও আব্দুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশামকে নির্দেশ দেন, তারা অনেক মুসহাফ তৈরি করেন... অতঃপর তাদের লিখিত এক-এক কপি তিনি প্রত্যেক অঞ্চলে প্রেরণ করেন এবং তা ব্যতীত অন্যান্য সহিফা ও মুসহাফে সংরক্ষিত কুরআন পোড়ানোর নির্দেশ দেন"।[1]

কোনো সাহাবি উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বিরোধিতা করেননি, ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যদিও ইখতিলাফ করেছেন, কিন্তু তা কুরআন পোড়ানো সংক্রান্ত ছিল না, বরং তার ইখতিলাফ ছিল এক-ভাষার কুরআন রেখে অন্যান্য ভাষার কুরআন নিঃশেষ করা সংক্রান্ত।

---

[1] বুখারি: (৪৬২৯)

পুরনো কুরআন দাফন করা অপেক্ষা পোড়ানো উত্তম। কারণ সাহাবিদের উপস্থিতিতে উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কুরাইশি ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষার কুরআন পুড়িয়েছেন। দ্বিতীয়ত দাফনকৃত কুরআনের উপর থেকে কখনো মাটি সরে অসম্মানের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই পুরনো কুরআন পোড়ানো ও পোড়ানোর পর ছাইগুলো দাফন করা অধিক শ্রেয়।

পুরনো কুরআন পানিতে ফেলার কোনো দলিল নেই, কোনো আদর্শ পূর্বপুরুষ এরূপ করেছেন মর্মে আমাদের নিকট কোনো তথ্য নেই। দ্বিতীয়ত পানিতে ভাসমান যে কোনো কাগজ ময়লা ও আবর্জনার স্থানে গিয়ে ঠেকতে পারে, তাই এ পদ্ধতি গ্রহণ করা ঠিক নয়।

শায়খ আব্দুর রহমান সুহাইম বলেন: "কুরআনুল কারিমের পুরনো ও ব্যবহার অনুপযুক্ত পৃষ্ঠা প্রযুক্তির সাহায্যে পুনরায় ব্যবহার করা বা অন্য কোনো কাজে লাগানো বৈধ নয়, বরং নিরাপদ স্থানে দাফন করা কিংবা পোড়ানো জরুরি"।[1]

আল্লাহর নাম, কুরআনের আয়াত কিংবা দোয়া ও যিকর সংক্রান্ত কাগজের সাথে সম্মানের ব্যবহার করা জরুরি। অনুরূপ হাদিসের কিতাবের সাথে সম্মানের আচরণ করা জরুরি, যদিও তার মর্যাদা

---

[1] http://saaid.net/Doat/assuhaim/60.htm

কুরআনুল কারিমের সমান নয়। অতএব রাস্তায় পরে থাকা কিংবা বাজার-সদাইয়ের কাগজে যদি আল্লাহর নাম, কুরআনের আয়াত কিংবা হাদিসের অংশ বিশেষ থাকে, দীন হিসেবে আমরা তার সাথে সম্মানের ব্যবহার করব। আল্লাহ তাওফিক দানকারী।

কুরআন শিক্ষার বিনিময় গ্রহণ করার বিধান

এ শিরোনামের অধীন তিনটি বিষয় আলোচনা করব: ক. কুরআন শিক্ষার বিনিময় গ্রহণ করার বিধান, খ. আল্লাহর আয়াতকে স্বল্প-মূল্যে বিক্রি করার অর্থ, গ. গোটা দুনিয়া তুচ্ছ ও সামান্য।

ক. কুরআন শিক্ষার বিনিময় গ্রহণ করা: শায়খ ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "কুরআনুল কারিম হিফয করানোর বিনিময় গ্রহণ করার বিধান কি? তিনি বলেন: কুরআনুল কারিম ও দীনি ইলম শিখানোর বিনিময় গ্রহণ করা দোষণীয় নয়, কারণ মানুষ শিক্ষার মুখাপেক্ষী। মুয়াল্লিমের পক্ষে অনেক সময় বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না, কারণ বৈষয়িক প্রয়োজন তার জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। অতএব কুরআনুল কারিমের পাঠ দান করা, কুরআন হিফয করানো ও দীনি শিক্ষার বিনিময় গ্রহণ করা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী বৈধ।

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত, সাহাবীদের একটি জামাত জনৈক আরব গোত্রের মেহমান হয়েছিল, ইতোমধ্যে

তাদের সরদারকে বিষাক্ত কীট দংশন করে, তারা তার যথাসাধ্য চিকিৎসা করে, কিন্তু কোনো ফায়দা হয়নি, অতঃপর তারা সাহাবীদের নিকট ঝাড়-ফুঁক তলব করল, ফলে সাহাবিদের একজন গিয়ে সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করেন, আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন। ঝাড়-ফুঁকের বিনিময়ে তারা একপাল বকরি শর্ত করেছিল, গ্রামবাসী সে শর্ত পূরণ করল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করার পূর্বে বকরির পাল বণ্টন করা থেকে বিরত থাকল, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«قَدْ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا»

"তোমরা ঠিক করেছ, তোমরা বণ্টন কর এবং আমার জন্য তোমাদের সাথে একভাগ রাখ"।[1] অপর হাদিসে তিনি বলেন:

«إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» أخرجه البخاري

"নিশ্চয় যার মোকাবিলায় তোমরা বিনিময় গ্রহণ কর, তার মধ্যে আল্লাহর কিতাব সবচেয়ে উত্তম বস্তু"।[2] এ থেকে প্রমাণিত হয়

---

[1] বুখারি: (২২৭৬), মুসলিম: (২২০১)

[2] বুখারি: (৫৭৩৭)

কুরআন শিক্ষার বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ, যেমন বৈধ ঝাড়-ফুঁকের বিনিময় গ্রহণ করা"।[1]

খ. আল্লাহর আয়াতকে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করার অর্থ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَا تَشۡتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗا وَإِيَّٰيَ فَٱتَّقُونِ ۝٤١ ﴾ [البقرة: ٤١]

"তোমরা আমার আয়াতের বিনিময়ে অল্পমূল্য গ্রহণ কর না এবং একমাত্র আমাকে ভয় কর"।[2] হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "অল্পমূল্য কী? তিনি বলেন: সমগ্র দুনিয়া অল্পমূল্য"।[3]

অত্র আয়াত ইহুদিদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। ইহুদি আলেমরা ধনী ও প্রভাবশালীদের স্বার্থে আল্লাহর কিতাব তাওরাতের বিধান বিকৃত করে ফতোয়া দিত এবং অন্যায়ভাবে বিচার করত, যেন ধনীদের উপর শাস্তি আরোপ না হয়। বিনিময়ে তারা অর্থ ও উপঢৌকন গ্রহণ করত।

তাদের আরেকটি অপরাধ ছিল, তাওরাতে বিদ্যমান নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণগান গোপন করা, যেন ইহুদি সমাজের

---

[1] ফতোয়া উলামায়িল বালাদিল হারাম: (৬২৩-৬২৪), মাজাল্লাতুল বুহুস: সংখ্যা (৪২), পৃষ্ঠা: (১৫০-১৫১), শায়খ ইবনে বায রহ.

[2] সূরা বাকারা: (৪১)

[3] ইবনে কাসির, সূরা বাকারার আয়াত নং: (৪১)

সাধারণ মানুষ মুসলিম না হয়, পাছে তাদের সম্পদ ও নেতৃত্ব হাত ছাড়া হবে। এভাবে তারা সাধারণ ইহুদিদের ইসলাম থেকে দূরে রাখত। তাওরাতের প্রতি ঈমানের দাবি ছিল তার বিধান মোতাবেক ফয়সালা করা, তাতে বিদ্যমান নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণগান প্রকাশ করা, সবার আগে তাদের ইসলাম গ্রহণ করা ও তার দিকে দাওয়াত দেওয়া, কিন্তু তারা করেছে বিপরীত। এ জন্য পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝٤٢﴾ [البقرة:٤١، ٤٢]

"আর তোমরা হককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত কর না এবং জেনে-বুঝে হককে গোপন কর না"।[1]

অতএব আয়াতের অর্থ হচ্ছে তোমরা তাওরাতে বিদ্যমান আল্লাহর বিধান ও নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণগান বিকৃত করার বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করা না, তোমরা যে পরিমাণ দুনিয়া গ্রহণ কর প্রকৃতপক্ষে তা অল্প, কারণ পুরো দুনিয়াই সামান্য, তার ক্ষুদ্র বস্তুর আবার কি মূল্য!

বস্তুত তারা যদি তাওরাতের বিধান অনুযায়ী ফয়লাসা করত, তাতে বিদ্যমান নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণগান দেখে ঈমান আনয়ন করত, অন্যদের নিকট প্রচার করে তার

---

[1] সূরা বাকারা: (৪২)

বিনিময় গ্রহণ করত, তাহলে তারা আল্লাহর আয়াতকে স্বল্পমূল্যে বিক্রয়কারী হত না, বরং তাদের উপার্জন হত হালাল ও উত্তম। কিন্তু তারা আল্লাহর আয়াতকে বিকৃত করার বিনিময় গ্রহণ করেছে, তার প্রচার ও বাস্তবায়ন করার বিনিময় গ্রহণ করেনি। অসৎ দোকানির খারাপ মাল গুঁজে দেওয়ার ন্যায় তাওরাতের বিকৃত বিধান ও নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য তারা সাধারণ মানুষের নিকট প্রচার করেছে। শুধু অর্থের লোভে এভাবে তারা নিজেদের ও সাধারণ মানুষের ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস করেছে।

এ আয়াত যদিও ইহুদিদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, কিন্তু যারা কুরআন-হাদিস অপব্যাখ্যা করে ভুল ফতোয়া দেয় তারাও তার অন্তর্ভুক্ত। যারা দীন মানে না, দীন বাস্তবায়ন করে না ও তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে না, তবে পার্থিব স্বার্থের জন্য কখনো বকধার্মিক বনে তারাও স্বল্পমূল্যে দীন বিক্রয়কারী।

অনুরূপ দীনের প্রতি দাওয়াত দেওয়া যাদের প্রকৃতি নয়, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যারা দীন বাস্তবায়ন করে না, কিন্তু ভোটের পূর্বে ধার্মিক বনে, হজ করে ও ওমরায় যায়, উদ্দেশ্য মানুষের সমর্থন আদায় করা, তারাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। তারা দুনিয়ার জন্য দীনকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা ধর্মনিরপেক্ষতা,

গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের ন্যায় ঈমান বিধ্বংসী কুফরী মতবাদে বিশ্বাসী।

অনুরূপ মাজার ও পীরদের খানকাসমূহ দীন বিকৃতকারী প্রতিষ্ঠান। তারা কখনো কুরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যা করে, কখনো জাল ও বানোয়াট হাদিস প্রচার করে, কখনো মিথ্যা গল্প-কাহিনী তৈরি করে দীনের অপব্যাখ্যা করে ও মানুষদের ধোঁকা দেয়।

অনুরূপ যারা অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মাদ্রাসা, ইসলামিক সেবা সংস্থা ও ইসলামিক দল গঠন করে দেশ-বিদেশে কালেক্টর, চাঁদা উত্তোলনকারী ও ভিক্ষুক ছড়িয়ে দেয়, অতঃপর ইসলাম ও মুসলিমের সেবার নামে টাকা সংগ্রহ করে নিজেদের ভিত্ত-বৈভব গড়ে তুলে, দানকারীদের দানে খিয়ানত করে, গরীবদের হক আত্মসাৎ করে ও জাতির সাথে প্রতারণা করে, তারাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। তারা ধর্মের নাম ও ধর্মীয় লেবাস ব্যবহার করে দুনিয়া উপার্জন করছে। তাদের দেখে দীনের প্রতি মানুষের অনীহা ও অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়, প্রকৃতপক্ষে তারা দীন ও তার অগ্রযাত্রার পথে বাঁধা, মুসলিম উম্মাহর কলঙ্ক।

কুরআন-হাদিস যাকাত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে খেতে নয়, সদকা দানের প্রতি উৎসাহ দিয়েছে উসুল করার প্রতি নয়, গরীবদের খোঁজ করে তাদের অনুগ্রহ করতে বলেছে, ধনীদের তালাশ করে তাদের থেকে অনুগ্রহ হাসিল করতে বলেনি। হাকিম ইবনে হিযাম

রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ»

"উপরের হাত নীচের হাতের[1] তুলনায় উত্তম, তুমি যার জিম্মাদার তার থেকে আরম্ভ কর, সচ্ছলতা থেকে সদকা করা সর্বোত্তম, আর যে পাক থাকতে চায় আল্লাহ তাকে পাক রাখেন এবং যে অমুখাপেক্ষী থাকতে চায় আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী রাখেন"।[2]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

«لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ »

"তোমাদের কেউ ভোরবেলা বের হোক ও নিজের পিঠে লাকড়ির বোঝা বহন করুক, অতঃপর তার থেকে সদকা করুক ও তাতে তৃপ্ত হয়ে মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী থাক, তার জন্য অনেক উত্তম কোনো ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা অপেক্ষা, সে তাকে প্রদান করুক অথবা তাকে তা নিষেধ করুক। কারণ উপরের হাত

---

[1] উপহারের হাত অর্থ দাতার হাত, আর নিচের হাত অর্থ গ্রহিতার হাত।

[2] বুখারি: ১৪২৮

নীচের হাতের তুলনায় উত্তম, আর তুমি যার জিম্মাদার তার থেকে শুরু কর”।[1]

সুবনাল্লাহ! দীনের নামে একশ্রেণীর লোক সবচেয়ে নিকৃষ্ট পেশা গ্রহণ করেছে। গাড়িতে চড়ে, রাস্তায় বসে ও চলন্তাবস্থায় হিন্দু-মুসলিম, নেককার-বদকার সবার নিকট ভিক্ষার হাত বৃদ্ধি করে কুরআনুল কারিমের নামে, মাদ্রাসার নামে, কখনো মসজিদের নামে। আবার কেউ রাস্তায় বসে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে, ইন্নালিল্লাহি ওয়া-ইন্নাইলাইহি রাজিউন। জান্নাত হাসিল করার দীনকে তারা ক্ষণস্থায়ী পার্থিব স্বার্থ হাসিল করার হাতিয়ার বানিয়েছে। আল্লাহ তাদের সর্বনাশ করুন। ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

«والله لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين»

“আল্লাহর শপথ, নৃত্য করে জীবিকা নির্বাহ করা আমার নিকট সহজ, দীনকে জীবিকা নির্বাহের উপকরণ বানানোর চেয়ে”। অতএব দীনকে দুনিয়া উপার্জনের হাতিয়ার বানানো নিকৃষ্টতম কাজ, আল্লাহ মুসলিম উম্মার কল্যাণ করুন এবং এ জাতীয় লোক থেকে ইসলামকে পবিত্র করুন।

গ. গোটা দুনিয়া তুচ্ছ:

---

[1] মুসলিম: (১০৪৪)

গোটা দুনিয়া আল্লাহর নিকট তুচ্ছ ও মূল্যহীন, তাই আল্লাহর দীনকে বিকৃত করার বিনিময়ে কেউ যদি গোটা দুনিয়া হাসিল করে সেও স্বল্পমূল্য হাসিল করল। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ قُلۡ مَتَٰعُ ٱلدُّنۡيَا قَلِيلٞ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظۡلَمُونَ فَتِيلًا ۝٧٧ ﴾ [النساء : ٧٧]

"বল, দুনিয়ার সুখ সামান্য, আর যে তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য আখেরাত উত্তম। আর তোমাদের প্রতি ফাতিলা[1] পরিমাণ জুলম করা হবে না"।[2] অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [الحديد: ٢٠].

"জেনে রেখো, পার্থিব জীবন তো কেবল ক্রীড়াকৌতুক, সাজসজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধনজনের প্রাচুর্য ছাড়া আর কিছু নয়, এক বৃষ্টির মত, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। আর পরকালে আছে

---

[1] খেজুরের বীচির উপরের পাতলা আবরণকে ফাতিলা বলা হয়।

[2] সূরা নিসা: (৭৭)

আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি, ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন তো ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়”।[1] অপর আয়াতে তিনি বলেন:

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [يونس: ٢٤].

“বস্তুত: পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম, অতঃপর তার সাথে মিশ্রিত হয়ে জমিনের উদ্ভিদরাজি ঘন হয়ে উদগত হলো, যা মানুষ এবং জীবজন্তু ভক্ষণ করে; এমন কি জমিন যখন নিজের শোভা ধারণ করে সৌন্দর্য-সুষমায় ভরে উঠলো আর তার মালিকরা মনে করলো যে, এখন এগুলো আমাদের আয়ত্তাধীন, তখন হঠাৎ করে দিনে অথবা রাতে এগুলোর ওপর আমার নির্দেশ আসলো এবং সেগুলোকে আমি এমন নিশ্চিহ্ন করে দিলাম, যেন গতকাল এর অস্তিত্বই ছিল না। এভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করি সেসব লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে”।[2]

---

[1] সূরা হাদিদ: (২০)

[2] সূরা ইউনুস: (২৪)

এটাই দুনিয়া ও তার বান্দার সর্বোত্তম উদাহরণ, বাড়ি-গাড়ি, ক্ষমতা ও প্রাচুর্যের কোনো মূল্য আল্লাহর নিকট নেই। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ»

“যদি আল্লাহর নিকট দুনিয়া মশার ডানা বরাবর হত, তিনি কোনো কাফিরকে তার থেকে পানির একঢোক পান করাতেন না”[1] আল্লাহ তা‘আলা চান না তার বিশেষ বান্দাদের নিকট দুনিয়া বিপুল পরিমাণ জমা হোক। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«كُنْ في الدنيا كأنَّك غريب، أو عابر سبيل» البخاري.

“দুনিয়াতে এমনভাবে থাক, যেন তুমি ভিনদেশী, অথবা পথিক”।[2] দুনিয়ার জীবন যত দীর্ঘ হোক খুব সামান্য, আখিরাতের সাথে তার কোনো তুলনা হয় না। আসহাবে কাহাফ তিন শো বছর গুহায় অবস্থান করেছিল, অতঃপর বলেছে:

﴿ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍۚ ١٩ ﴾ [الكهف: ١٩]

---

[1] তিরমিযি: ২৩২০, তিনি হাদিসকে সহি ও গরীব বলেছেন।

[2] বুখারি: (৬৪১৬)

“আমরা এক দিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি”।[1] আল্লাহ এক বান্দাকে এক শো বছর মৃত রাখার পর জীবিত করেছেন, সেও জেগে বলেছে:

﴿ لَبِثۡتُ يَوۡمًا أَوۡ بَعۡضَ يَوۡمٖۖ ٢٥٩ ﴾ [البقرة: ٢٥٩]

“আমি একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি”।[2] অপর আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ أَفَرَءَيۡتَ إِن مَّتَّعۡنَٰهُمۡ سِنِينَ ٢٠٥ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ٢٠٦ مَآ أَغۡنَىٰ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ٢٠٧ ﴾ [الشعراء : ٢٠٥، ٢٠٧]

“তুমি কি লক্ষ্য করেছ, আমি যদি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাসের সুযোগ দিতাম। অতঃপর তাদের নিকট এসে পড়ত যার ওয়াদা তাদেরকে করা হয়েছে। তখন তাদের ভোগ-বিলাসের জন্য যা দেওয়া হয়েছিল, তা তাদের কোনো কাজে আসত না”।[3]

এ হচ্ছে দুনিয়া ও তার সুখ-ভোগের প্রকৃতি। দুনিয়ার দুঃখ সুখ ভুলিয়ে দেয়, দুনিয়ার মৃত্যু জীবনের স্বাদ নিঃশেষ করে দেয়। দুনিয়া মূলত পরীক্ষার হল, দুঃখ-মুসিবত ও নিরানন্দের চারণভূমি। তাই আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার প্রতি নিরুৎসাহ ও আখিরাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন:

---

[1] সূরা কাহাফ: (১৯)

[2] সূরা বাকারাহ: (২৫৯)

[3] সূরা শুআরা: (২০৫-২০৭)

﴿ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ ۝٧٧ ﴾ [النساء : ٧٧]

"যে তাকওয়া অর্জন করেছে তার জন্য নিশ্চয় আখেরাত উত্তম"।[1] মুত্তাকীর জন্য আখিরাত উত্তম, আল্লাহ যাকে কুরআনুল কারিম দান করেছেন তিনি মুত্তাকী হবেন স্বাভাবিক। তার পক্ষে সমীচীন নয় দুনিয়ার তুচ্ছ-মূল্যহীন ভোগ-বিলাসের জন্য আখেরাত বিনষ্ট করা। আল্লাহর কালামকে ধারণ করে তার কাছে প্রার্থনা করুন, যেসব প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস বৈধ ও সম্মানজনক সেখানে নিজেকে নিয়োজিত করুন।[2] দীন হিফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার উপর ন্যস্ত, কোনো মানুষকে তার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। মানুষের কাজ হচ্ছে দীনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে নিজেকে ধন্য করা, দীন থেকে বিচ্যুত হয়ে নয়!! আল্লাহ সতর্ক করে বলেন:

﴿ بَلۡ تُؤۡثِرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا ۝١٦ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓ ۝١٧ ﴾ [الاعلى: ١٦، ١٧]

"বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী"।[3]

---

[1] সূরা নিসা: (৭৭)

[2] সরকার পরিচালিত দীনি প্রতিষ্ঠান, অথবা শিক্ষার্থীদের ফী বা ধনবান মুসলিমদের অনুদান দ্বারা পরিচালিত দীনি প্রতিষ্ঠান, যার ছাত্র-শিক্ষক বাড়ি-গাড়ি, রাস্তা-ঘাঁট ও হাঁট-বাজারে চাঁদার জন্য দীনকে অপমান করে না।

[3] সূরা আলা: (১৬-১৭)

কুরআনুল কারিমের হাফিযদের পরবর্তী লক্ষ্য হোক আখিরাত, যার সাথে দুনিয়ার কোনো তুলনা নেই। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, একটি হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

«أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٧ ﴾ [السجدة : ١٧]

“আমি আমার বান্দার জন্য তৈরি করেছি, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শ্রবণ করেনি এবং কোনো মানুষের অন্তরে তার কল্পনাও হয়নি। আবু হুরায়রা রা. বলেন: তোমরা (প্রমাণ) চাইলে তিলাওয়াত কর: ‘কোনো মানুষ জানে না, চোখ শীতলকারক কি জিনিস তাদের জন্য গোপন রাখা হয়েছে”।[1]

মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন তিলাওয়াত করার বিধান

আমাদের দেশের হাফিয সাহেব ও হিফয খানার ছাত্ররা বেশ কিছু নিন্দনীয় কাজে ব্যবহৃত হন, কেউ জেনে, কেউ না-জেনে। ঈসালে সাওয়াব তার একটি। কেউ লাশের পাশে বসে, কেউ চার দিন বা চল্লিশ দিন শেষে, কেউ মৃত্যু বার্ষিকীতে, কেউ কবরস্থান গিয়ে,

---

[1] সূরা সাজদাহ: (১৭)

একা বা যৌথভাবে কুরআন পড়েন অতঃপর তার সাওয়াব মৃত ব্যক্তিকে বখশে দেন। এরূপ করা বৈধ নয়। এতে বেশ কিছু আমল সংঘটিত হয়, তার সবক'টি নিষিদ্ধ, যেমন: ১. যৌথ খতম করা, ২. সবিনা পড়া, ৩. ঈসালে সাওয়াব করা, ৪. লোক ভাড়া করা, ৫. কবর স্থান গিয়ে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা ইত্যাদি।

মৃত ব্যক্তির নামে কুরআনুল কারিম খতম করানোর সময় এসব বিদআতি কর্মকাণ্ডসমূহ সংগঠিত হয়। নিম্নে তার অনিষ্ট সম্পর্কে আলোচনা করছি: ১. যৌথ খতম করা: নবী ও সাহাবিদের যুগে যৌথ খতমের কোনো প্রচলন ছিল না, আমাদের কোনো আদর্শ পূর্বপুরুষ যৌথভাবে কুরআনুল কারিম খতম করেছেন প্রমাণ নেই, অতএব কুরআনুল কারিমের যৌথ খতম বিদআত কোনো সন্দেহ নেই।

২. এক দিনে সবিনা পড়া বৈধ নয়:[1] কুরআনুল কারিম বিরতিহীন পাঠ করে খতম করাকে সবিনা বলা হয়। সাধারণত দু'জন মিলে সবিনা পড়া হয়। প্রথম কারী/ পাঠক ক্লান্ত হলে দ্বিতীয় কারী পড়া আরম্ভ করেন। এভাবে কেউ ৮ঘণ্টায়, কেউ ১০ঘণ্টায়, কেউ ১২ঘণ্টায় কুরআনুল কারিম খতম করেন। এ জাতীয় আমলের

[1] কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করার আদব দেখুন।

অস্তিত্ব নবী, সাহাবি কিংবা উত্তম যুগের কোনো মনীষীর মাঝে ছিল না, তাই এ আমলও বিদআত কোনো সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়ত সবিনার সময় তাজবিদের বিধান লঙ্ঘন করে কুরআনের অর্থ ও উচ্চারণ বিকৃত করা হয়।[1] তৃতীয়ত মাইক ব্যবহার করে শিশু-অসুস্থ-ঘুমন্তদের কষ্ট দেয়া ও কুরআনুল কারিমের অবমাননা করা হয়। অতএব শরীয়তের দৃষ্টিতে এ আমল হারাম।

৩. ঈসালে সাওয়াব করা আরেকটি বিদআত: কুরআনুল কারিম কিংবা হাদিসের কোথাও ঈসালে সাওয়াব করার প্রমাণ নেই। নবী কিংবা সাহাবিদের কেউ ঈসালে সাওয়াব করেছেন বিশুদ্ধ কোনো দলিল নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩ ﴾ [النجم : ٣٩]

"আর এই যে, মানুষ যা চেষ্টা করে, তাই সে পায়"।[2] কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা জীবিত ব্যক্তির প্রচেষ্টা ও আমল, তার সাওয়াব জীবিত ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ থাকবে, দলিল ব্যতীত মৃত ব্যক্তিকে বখশে দেওয়া যাবে না। উপর্যুক্ত আয়াতের দাবি এটাই।

৪. কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করার জন্য লোক ভাড়া করা আরেকটি বিদআত: কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত একটি খালেস ইবাদত, তার জন্য ভাড়া-খাঁটা, কারো থেকে বিনিময় গ্রহণ করা

---

[1] তাজবিদের সাথে কুরআনুল কারিম পাঠ করা ওয়াজিব।

[2] সূরা নাজম: (৩৯)

বা কারো কৃতজ্ঞতা আদায় করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কুরআন তিলাওয়াত করে, সে যেন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে। ইমাম তিরমিযি তার সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেন: ইমরান ইবন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু জনৈক গল্পকারের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, সে কুরআন পড়ে মানুষের নিকট ভিক্ষা/ প্রার্থনা করছিল, তিনি ইন্নালিল্লাহ বলে উঠলেন। অতঃপর বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

«من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس»

“যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে, সে যেন তার ওসিলা দিয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, কারণ অতিসত্বর এমন এক দল আভির্ভূত হবে, যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে আর তার ওসিলা দিয়ে মানুষের নিকট প্রার্থনা করবে।”[1]

৫. কবর-স্থান গিয়ে কুরআন পড়া বিদআত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারত করার সময় বলতেন:

---

[1] আহমদ: (৪/৪৩২-৪৩৩), (৪৩৬-৪৩৭), (৪৩৯), (৪৪৫), তিরমিযি: (৫/১৭৯), হাদিস নং: (২৯১৭), ইবনে আবি শায়বাহ: (১০/৪৮০), তাবরানি: (১৮/১৬৬-১৬৭), হাদিস নং: (৩৭০-৩৭৪), বাগাভী: (৪/৪৪১), হাদিস নং: (১১৮৩)

«السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافية»

“হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলিমগণ, তোমাদের উপর সালাম, ইনশাআল্লাহ অতিসত্বর আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো, আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।”[1]

কবর-স্থান গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কুরআন তিলাওয়াত করেননি, যদি তার বৈধতা থাকত বা মৃতরা তার দ্বারা উপকৃত হত অবশ্যই তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন ও সাহাবিদের তার নির্দেশ দিতেন। কারণ, তার সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ١٢٨﴾ [التوبة : ١٢٨]

“নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু”।[2]

---

[1] ইবনে মাজাহ: (১৫৩৬)

[2] সূরা তওবা: (১২৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে দয়া, উম্মতের কল্যাণ কামনা ও অনুগ্রহ থাকা সত্যেও তিনি কবরস্থান গিয়ে এরূপ করেন নি, অতএব তাতে কোনো কল্যাণ নেই। তিনি শুধু দোয়া ও উপদেশ হাসিল করতেন তাতেই কল্যাণ, অতিরিক্ত কাজগুলো বিদআত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»

“আমাদের এ দীনে যে এমন কিছু আবিষ্কার করল, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা পরিত্যক্ত।”[1] ঈসালে সাওয়াব সম্পর্কে সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের ফতোয়া নিম্নে প্রদত্ত হল:

ঈসালে সাওয়াব সম্পর্কে উলামা পরিষদের ফতোয়া

প্রশ্ন: কুরআন তিলাওয়াত ও অন্যান্য ইবাদতের সাওয়াব কি মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে, সন্তান বা আত্মীয় যার পক্ষ থেকে হোক?

উত্তর: আমরা যতদূর জানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করে আত্মীয় বা অনাত্মীয় কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সাওয়াব করেন নি। যদি তাদের নিকট কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করার সাওয়াব পৌঁছাত বা

---

[1] বুখারি: (২৫১২), মুসলিম: (৩২৪৮)

তার দ্বারা তারা উপকৃত হত, তাহলে অবশ্যই তিনি তা করতেন, উম্মতকে বাতলে দিতেন, যেন তাদের মৃতরা উপকৃত হয়। তিনি ছিলেন মুমিনদের উপর দয়ালু ও অনুগ্রহশীল। খুলাফায়ে রাশেদিন ও সকল সাহাবি তার অনুসরণ করেছেন, –আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন– আমাদের জানা মতে তারা কেউ কুরআন তিলাওয়াত করে ঈসালে সাওয়াব করেন নি। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবিদের অনুসরণ করাই আমাদের জন্য কল্যাণকর। তিনি বলেছেন:

«اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»

"খবরদার! তোমরা নতুন আবিষ্কৃত বস্তু থেকে সতর্ক থাক, কারণ প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত বস্তু বিদ'আত, আর প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহি।"[1] তিনি অপর হাদিসে বলেন :

«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»

"যে আমাদের এ দ্বীনে এমন কিছু আবিষ্কার করল, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা পরিত্যক্ত।"[2]

আমাদের দৃষ্টিতে মৃতদের জন্য কুরআন তিলাওয়াত করা বা করানো জায়েয নয়, তার সাওয়াব মৃতদের নিকট পৌঁছায় না, এরূপ করা বিদ'আত। যে ইবাদতের সাওয়াব মৃতদের নিকট

---

[1] আবু দাউদ: (৩৯৯৩)

[2] বুখারি: (২৫১২), মুসলিম: (৩২৪৮)

পৌঁছে মর্মে দলিল রয়েছে তা অবশ্য গ্রহণীয়। যেমন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সদকা ও হজ করা; যেসব ইবাদতের পক্ষে কোনো দলিল নেই তার সাওয়াব পৌঁছানো বৈধ নয়। তাই প্রমাণিত হল, কুরআন তিলাওয়াত করে মৃতদের ঈসালে সাওয়াব করা বৈধ নয়, তাদের নিকট তার সাওয়াব পৌঁছায় না, বরং তা বিদ'আত। এটা আলেমদের বিশুদ্ধ অভিমত। আল্লাহ ভালো জানেন।

সূত্র :

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

[আল-লাজনাতুদ দায়েমাহ্ লিল বুহুসিল ইলমিয়াহ ওয়াল ইফতা]

"ইলমি গবেষণা ও ফতোয়ার স্থায়ী পরিষদ"

সদস্য	ভাইস-চেয়ারম্যান	চেয়ারম্যান
আব্দুল্লাহ ইবন গুদাইয়ান	আব্দুর রাজ্জাক আফিফী	আব্দুল আযিয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায

তাবিজ ও তাবিজ জাতীয় বস্তুর ব্যবহার

আমাদের দেশের হিফয-খানার ছাত্র/ শিক্ষক সবার মাঝে কম-বেশী ধর্মীয় অজ্ঞতা বিরাজ করে। এ কারণে সাধারণ মুসলিমের ন্যায় তারা কুসংস্কার, বিদআত কখনো শিরকে লিপ্ত হয়, তাবিজ-কবচ-কড়ি ও সুতা ব্যবহার করে, তাই তাদেরকে সতর্ক করা

জরুরি। এ শিরোনামের অধীন চারটি বিষয় আলোচনা করব: ক. ইসলামের দৃষ্টিতে তাবিজ, খ. কুরআন-হাদিসের তাবিজ, গ. তাবিজ ঝুলানো কোন প্রকার শিরক, ঘ. চিকিৎসা পদ্ধতি, শরয়ী ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজের পার্থক্য।

ইসলামের দৃষ্টিতে তাবিজ

ইমরান বিন হুসাইন রাদিআল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তির হাতে তামা/ স্বর্ণের আংটি দেখে বললেন,

«وَيْحَكَ مَا هَذِهِ ؟ " قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ، قَالَ: " أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، انْبِذْهَا عَنْكَ، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا»

"ধ্বংস তোমার, এটা কী? সে বলল: অহেনার[1] অংশ। তিনি বললেন: মনে রেখ, এটা তোমার দুর্বলতা ব্যতীত কিছু বৃদ্ধি করবে না, এটা তোমার থেকে ছুড়ে মার, কারণ তুমি যদি মারা যাও আর এটা তোমার উপর থাকে, তুমি কখনো সফল হবে না"[2]

উকবা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

«مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً، فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً، فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ»

---

[1] অহেনা অর্থ এক প্রকার হাড়, যার অংশ বিশেষ তাবিজে ব্যবহার করা হয়।

[2] মুসনাদে আহমদ: (১৯৫৪৯), নাসায়ী: (৯/৩৪৯), ইবনে মাজাহ: (৩৫৩১), ইবনে হিব্বান: (৬২২২), হাদিসটি সহিহ্।

“যে তামিমাহ[1] ঝুলালো, আল্লাহ তাকে পূর্ণতা দেবেন না, আর যে শঙ্খ ঝুলালো আল্লাহ তাকে নিরাপত্তা দিবেন না”।[2]

উকবা বিন আমের আল-জোহানি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে একদল লোক উপস্থিত হল। তাদের নয়জনকে তিনি বায়আত করলেন একজনকে করলেন না। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! নয়জনকে বায়আত করলেন, আর তাকে ত্যাগ করলেন? তিনি বললেন:

«إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً "، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، فَبَايَعَهُ، وَقَالَ: " مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ »

---

[1] তামিমার সংজ্ঞা: রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ অথবা বদ-নজর প্রতিরোধ অথবা সম্ভাব্য কোনো অনিষ্ট দূর করার জন্য শরীরে ঝুলানো বস্তুকে তামিমাহ বলা হয়, হোক সেটা কড়ি, অথবা লাকড়ি, অথবা তাগা, অথবা কাগজ কিংবা কোনো বস্তু। ইসলাম পূর্বযুগে বদ-নজর থেকে সুরক্ষা এবং গৃহ-পালিত পশু-পাখী ও দুষ্ট প্রাণীকে বশ করার জন্য, কখনো আত্মরক্ষার জন্য মুশরিকরা তামিমাহ গলায় বা শরীরের কোনো অংশে ঝুলাত। তাদের বিশ্বাস ছিল, তাকদির প্রতিরোধ ও অনাগত অনিষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে তামিমাহ। তারা কখনো তামিমাহ দ্বারা গায়রুল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করত, যা ছিল সরাসরি শিরক ও তাওহীদ পরিপন্থী। ইসলাম তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

[2] আহমদ: (১৬৯৫১), হাকেম: (৪/২১২), মুসনাদে আবি ইয়ালা আল-মুসিলি: (১৭৫৯)

“তার উপর তাবিজ রয়েছে, তিনি স্বীয় হাত বের করে তা ছিঁড়ে ফেললেন, অতঃপর তাকে বায়আত করলেন, এবং বললেন যে তাবিজ ঝুলালো সে শিরক করল।[1]

একদা হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু জনৈক ব্যক্তির হাতে জ্বরের তাগা দেখে কেটে ফেললেন। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন:

﴿ وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ ١٠٦ ﴾ [يوسف: ١٠٥]

“তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে শিরক করা অবস্থায়”।[2] এ ঘটনা প্রমাণ করে তাগা ব্যবহার করা শিরক।

আবু বশির আনসারি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফর সঙ্গী ছিলেন। তিনি জনৈক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন, -মানুষেরা তখন ঘুমের বিছানায় ছিল-,

«أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ»

“কোনো উটের গলায় সুতার মালা (ধনুকের ছিলা) বা কোনো প্রকার মালা রাখা যাবে না, অবশ্যই কেটে ফেলা হবে”।[3] নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের গলার সুতা ও মালা কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তাবিজ ঝুলানোর উপায় অবশিষ্ট না থাকে।

---

[1] সহি মুসনাদে আহমদ: (১৬৯৬৯), সহি হাদিস সমগ্র : (৪৯২), হাকেম।

[2] ইউসুফ: (১০৬) তাফসিরে ইবনে কাসির।

[3] বুখারি: (৩০০৫), মুসলিম: (২১১৮)

আবু ওয়াহহাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«وَارْتَبِطُوا الْخَيْلَ، وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَكْفَالِهَا، وَقَلِّدُوهَا وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ»

"তোমরা ঘোড়া বেঁধে রাখ, তার মাথায় ও ঘাড়ে হাত বুলাও এবং তাকে লাগাম পরাও, তবে সুতা/ মালা পরিয়ো না।[1]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর স্ত্রী জয়নব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা আব্দুল্লাহ বাড়িতে এসে আমার গলায় তাগা দেখতে পান। তিনি বলেন, এটা কী? আমি বললাম, এটা পড়া তাগা, এতে ঝাড়-ফুঁক করা হয়েছে। তিনি তা কেটে ফেললেন এবং বললেন, আব্দুল্লাহর পরিবার শিরক থেকে মুক্ত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

«إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ»

"ঝাড়-ফুঁক,[2] তাবিজ ও তিওয়ালাহ[3] নিঃসন্দেহে শিরক"।[4]

---

[1] সুনানে নাসায়ী সুগরা: (৩৫৬৫), মুসনাদে আহমদ: (১৮৫৫২)

[2] **রুকা** অর্থ নিষিদ্ধ ঝাড়-ফুঁক, আউনুল মাবুদ, হাদিস নং: (৩২৭২)

[3] আসমায়ি বলেন: **তিওয়ালাহ**: একপ্রকার যাদু, স্বামীর নিকট স্ত্রীকে প্রিয় করার জন্য যার ব্যবহার করা হয়। মোল্লা আলি কারি বলেন: **'তিওয়ালাহ'** একপ্রকার যাদু, অথবা যাদুর মন্ত্র পাঠ করা তাগা, অথবা কাগজ, তাতে মহব্বত সৃষ্টির মন্ত্র পাঠ করা হয়। আউনুল মাবুদ, হাদিস নং: (৩২৭২)

[4] আবু দাউদ: (৩৮৮৩), আহমদ: (৩৬০৪), ইবনে হিব্বান: (৬০৯০), ইবনে মাজাহ: (৩৫৩০), সহি হাদিস সমগ্র: (১৩১)

এসব দলিল বলে, রোগ-ব্যাধি দূর বা প্রতিরোধ করার জন্য মানুষ বা জীব-জন্তুর শরীরে, কিংবা ক্ষেত-খামারে তাবিজ, তাগা, কড়ি ও সুতা ইত্যাদি ব্যবহার করা শিরক। কারণ, তামিমাহ ও তামিমাহ জাতীয় বস্তুর উপর নিষেধাজ্ঞার হাদিসগুলো ব্যাপক, তাই সবধরণের তাবিজ শিরক। কুরআন/ গায়রে কুরআন কোনো বিভেদ নেই।

দ্বিতীয়ত যেসব দলিলে তাবিজের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তাতে কুরআন-হাদিসের তাবিজ বৈধ বলা হয়নি, যেমন শিরক মুক্ত ঝাড়-ফুঁক বৈধ বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ»

"তোমাদের ঝাড়-ফুঁক আমার কাছে পেশ কর, ঝাড়-ফুঁকে কোনো সমস্যা নেই, যদি তাতে শিরক না থাকে"।[1]

এ হাদিসে যেরূপ কুরআনুল কারিমের তাবিজকে পৃথকভাবে বৈধ বলা হয়নি, যেমন শিরক মুক্ত ঝাড়-ফুককে বৈধ বলা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবিদের জীবনে তাবিজের কোনো প্রমাণ নেই। হাদিসের পাঠকমাত্র দেখবে, দোয়া ও যিকর সংক্রান্ত সকল হাদিসের ভাষা হচ্ছে, 'যে ইহা বলবে',

[1] মুসলিম : (২২০২), ইবনে হিব্বান: (৬০৯৪)

অথবা ‘যে ইহা পড়বে’ ইত্যাদি; একটি হাদিসেও নেই ‘যে ইহা লিখে রাখবে’, অথবা ‘যে ইহা ঝুলাবে’। ইবনে আরাবি বলেন: “কুরআন ঝুলানো সুন্নত নয়, কুরআন পাঠ করা সুন্নত”।

ইব্রাহিম নখয়ি রহ. বলেন, “আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের সাথীগণ কুরআন ও গায়রে কুরআন সর্বপ্রকার তাবিজ অপছন্দ করতেন, যেমন আলকামা, আসওয়াদ, আবু ওয়ায়েল, মাসরুক ও রাবি বিন খায়সাম প্রমুখ তাবেয়িগণ”।[1]

শিরক ও পাপের পথ বন্ধ করার স্বার্থে সকল তাবিজের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা জরুরি। কুরআনের তাবিজ শিরকী তাবিজের পথ উন্মুক্ত করে। আদর্শ মনীষীগণ তাবিজ অপছন্দ করতেন, অথচ তাদের যুগ ছিল বিদআত ও শিরক মুক্ত, ওহী ও ঈমানের নিকটবর্তী। আমাদের যুগ মূর্খতা ও বিদআত সয়লাবের যুগ, এতে তাবিজ বৈধ বলার অর্থ উম্মতকে শিরকের দিকে ঠেলে দেওয়া। দ্বিতীয়ত তাবিজে ব্যবহৃত কুরআন নাপাক বস্তু বা স্থানের সম্মুখীন হয়, বিশেষত বাচ্চাদের গলার তাবিজ, যা থেকে কুরআনকে পবিত্র রাখা জরুরি।

তাবিজ ব্যবহারকারীরা সাধারণত কুরআন-হাদিসের ঝাড়-ফুঁক করে না, তাবিজকেই যথেষ্ট ভাবে। তাদের অন্তর তাবিজের সাথে

---

[1] ফতহুল মজিদ।

ঝুলন্ত থাকে, যদিও তারা স্বীকার করে না, তবে তাবিজ খুললে তার সত্যতা প্রকাশ পায়! কারো চেহারা বিবর্ণ হয়, কারো শরীরে কাঁপুনি উঠে। যদি তাদের অন্তর আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত থাকত ও তাতে পূর্ণ বিশ্বাসী হত, কখনো তারা মন এমন বস্তুর দিকে ধাবিত হত না, যার সম্পর্ক কুরআন-হাদিসের সাথে নেই। বস্তুত তাবিজ ব্যবহার করে তারা কুরআনের সাথে নয়, বরং কাগজ ও জড় বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হয়।

তাবিজ একটি জড়-বস্তু, তার সাথে রোগ-মুক্তির কোনো সম্পর্ক নেই। তাবিজকে রোগ মুক্তির উপায় সাব্যস্ত করার জন্য অবশ্যই দলিল প্রয়োজন, তার পক্ষে কোনো শরীয় দলিল নেই। কারো রোগ-ব্যাধি হলে শরয়ী ঝাড়-ফুঁক করা সুন্নত, যেমন জিবরীল 'আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের করেছেন। এটাই বৈধ ও শরীয়ত অনুমোদিত পন্থা।

বৈধ ঝাড়-ফুঁকের বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ, যদি তার দ্বারা আরোগ্য লাভ হয় এবং সুন্নত মোতাবেক ঝাড়-ফুঁক করা হয়; যেমন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ বিনিময় গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আমাদের সমাজের একশ্রেণীর আলেম তাবিজ দেন ও আরোগ্য লাভের পূর্বে বিনিময় গ্রহণ করেন। তারাও দলিল হিসেবে বুখারি শরীফের হাদিসটি পেশ করেন, অথচ সেখানে

স্পষ্ট আছে সাহাবিগণ তাবিজ দেননি, বরং সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন এবং আরোগ্য লাভ করার পর বিনিময় গ্রহণ করেছেন, আগে নয়। অতএব এ হাদিসকে তাবিজ দেয়া ও তার বিনিময় গ্রহণ করার দলিল হিসেবে পেশ করা অপব্যাখ্যা ব্যতীত কিছু নয়।

কুরআন-হাদিসের তাবিজ

কুরআন-হাদিসের তাবিজ সম্পর্কে আলেমগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। পূর্বোক্ত দলিলের ভিত্তিতে একদল আলেম বলেন, কুরআন-গায়রে কুরআন সর্বপ্রকার তাবিজ শিরক। কতক আলেম বলেন, কুরআন-হাদিসের তাবিজ বৈধ। তারা দলিল হিসেবে আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ব্যক্তিগত আমল পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন ঘুমে ঘাবড়ে যায়, তার বলা উচিত:

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ»

"আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তাঁর গজব ও শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানসমূহের কুমন্ত্রণা ও তাদের উপস্থিতি থেকে"।[1] ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন: "হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে

---

[1] আহমদ : (১৬১৩৭), তিরমিযি : (৩৫২৮), আবু দাউদ: (৩৮৯৩)

আমর সম্পর্কে আছে, তিনি তার সাবালক বাচ্চাদের দোয়াটি শিক্ষা দিতেন, আর যারা সাবালিগ হয়নি কাগজে লিখে তাদের গলায় দোয়াটি ঝুলিয়ে দিতেন"।[1]

ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, "আব্দুল্লাহ বিন আমের বর্ণিত হাদিসের সনদ মুহাদ্দিসদের নিকট বিশুদ্ধ নয়। বিশুদ্ধ মানলেও এটা তার ব্যক্তিগত আমল, অসংখ্য সাহাবির বিপরীত তার ব্যক্তিগত আমল দলিল যোগ্য নয়। ইমাম শাওকানি রহ. বলেন: এ হাদিসের সনদে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রয়েছে, তার সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের অভিযোগ প্রসিদ্ধ। আলবানি রহ. বলেন, হাদিসের শেষাংশ: আব্দুল্লাহর ঘটনা ব্যতীত অবশিষ্টাংশ সহি"।[2] অতএব আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নিজের নাবালিগ বাচ্চাদের গলায় দোয়াটি লিখে ঝুলাতেন কথাটি সঠিক নয়।

তাবিজ কোন প্রকার শিরক

উক্ত আলোচনার পর তাবিজ ত্যাগ করার জন্য কারো ফতোয়ার প্রয়োজন হয় না, তাবিজ ব্যবহার করা ছোট-শিরক, না বড়

---

[1] তিরমিযি: (৩৫২৮), আহমদ: (৬৬৫৭) এ হাদিস সহি হলে সাবালিগ বাচ্চা কিংবা বড়দের গলায় তাবিজ ঝুলানো বৈধ প্রমাণ হয় না, শুধু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বৈধ বলা যায় তাও যারা দোয়া পড়তে পারে না।

[2] সহি তিরমিযি: (৩৫২৮), সহি হাদিস সমগ্র: (১/৫২৯), আত-তালিক আলা-মুসনাদি আহমদ: (১১/২৯৬), 'আন-নাহজুজ সাদিদ' লিদ-দুসারি: (১১১)

শিরক। কুরআনুল কারিমের তাবিজ ব্যবহার করা কারো নিকট শিরক, কারো নিকট শিরক নয়, কুরআন ব্যতীত অন্যান্য তাবিজ সবার নিকট শিরক। যারা বলেন কুরআনের তাবিজ শিরক নয়, তাদের নিকট তাবিজ ত্যাগ করার কারণে কেউ গুনাগার হবে না, কিন্তু যারা শিরক বলেন, যদি তাদের ফতোয়া ঠিক হয়, তাহলে তাবিজ ব্যবহারকারীর পরিণতি কী হবে!?

অতএব তাবিজে কোনো কল্যাণ নেই। বর্তমান মুসলিমদের শরীরে যে, তাবিজ-কবচ, মাদুলি-কড়ি, শামুক-ঝিনুক, প্রাণীর হাড়, গাছের ছাল, তামা-লোহা-সুতা-রাবার-তাগা ও অন্যান্য ধাতব বস্তু দেখা যায়, আবার কখনো জীব-জন্তুর শরীরে, ঘরের খুঁটি ও গাছের ডালে; মাটির ভিতর ও বিছানার নিচে এসব বস্তু পুঁতে রাখতে দেখা যায়, তার অধিকাংশ বৈধ! তাবিজের পথে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে, সন্দেহ নেই। ইতিহাস থেকে জানা যায়, মাদুলি, তাবিজ ও তাগা ইত্যাদি কতক অমুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতীক ছিল। আল্লাহ মুসলিম সমাজকে এসব বস্তু থেকে পবিত্র করুন।

চিকিৎসা পদ্ধতি, শরয়ী ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজের পার্থক্য

আল্লাহ তা'আলা রোগ নাযিল করেছেন, রোগের সাথে ওষুধও নাযিল করেছেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً »

“আল্লাহ কোনো রোগ নাযিল করেননি, তবে অবশ্যই তার জন্য আরোগ্য নাযিল করেছেন”।[1] জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ »

“প্রত্যেক রোগের জন্য ওষুধ রয়েছে, যখন রোগের সাথে ওষুধের মিল হয়, আল্লাহর ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ হয়”।[2] ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلا أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءٌ، جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ، وَعَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ»

“নিশ্চয় আল্লাহ কোনো রোগ নাযিল করেননি, তবে অবশ্যই তার সাথে ওষুধ নাযিল করেছেন, যে জানতে পারেনি সে জানেনি, আর যে জানতে পেরেছে সে জেনেছে”।[3]

উসামাহ ইবনে শারিক বলেন, গ্রামের লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা চিকিৎসা গ্রহণ করব না? তিনি বললেন:

---

[1] বুখারি: (৫৬৭৮),

[2] মুসলিম: (২২০৬)

[3] সহি ইবনে হিব্বান: (১৩/৪২৭)

«نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ، تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، أَوْ قَالَ: دَوَاءً، إِلَّا دَاءً وَاحِدًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ»

"অবশ্যই হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর, কারণ আল্লাহ কোনো রোগ রাখেননি, তবে অবশ্যই তার জন্য নিরাময় রেখেছেন, অথবা বলেছেন: ওষুধ রেখেছেন, তবে একটি রোগ ব্যতীত, তারা বলল: হে আল্লাহর রাসূল, সে রোগটি কী? তিনি বললেন: বার্ধক্য"।[1]

অবশ্য কোনো হারাম বস্তুতে আল্লাহ্ তার বান্দাদের জন্য আরোগ্য রাখেননি। উম্মে সালামাহ বলেন, আমার এক মেয়ে অসুস্থ হয়েছিল, আমি একটি পাত্রে তার জন্য 'নাবিজ'[2] তেরি করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন পাতিলটি উতরাতে ছিল, তিনি বললেন: এটা কী? উম্মে সালামাহ উত্তর দিলেন: আমার মেয়েটা অসুস্থ, আমি তার জন্য ইহা তৈরি করছি। তিনি বললেন:

«إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ»

---

[1] তিরমিযি: (২০৩৮)

[2] আঙ্গুরের রস দ্বারা তৈরি নেশা জাতীয় পানীয়।

“নিশ্চয় আল্লাহ হারাম বস্তুতে তোমাদের আরোগ্য রাখেননি”।[1] অতএব আল্লাহ তা‘আলা রোগের জন্য আরোগ্য রেখেছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে আরোগ্য লাভের জন্য অবশ্যই হালাল বস্তু ও বৈধ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

বৈধ চিকিৎসা দু’প্রকার:

১. কুরআনুল কারিম বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত বিভিন্ন বস্তুর গুণাগুণের ভিত্তিতে চিকিৎসা করা; অনুরূপ কুরআন বা হাদিসের দোয়া দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা, এ জাতীয় তদবিরকে নববী চিকিৎসা ও শরয়ী ঝাড়-ফুঁক বলা হয়; যার বর্ণনা হাদিসের কিতাবে রয়েছে। এ জাতীয় চিকিৎসা দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছায় বান্দা আরোগ্য লাভ করে।

২. জেনারেল চিকিৎসা তথা বস্তুর গুণাগুণ ও তার প্রভাবের উপর পরিচালিত গবেষণার ভিত্তিতে চিকিৎসা করা। বস্তুর প্রভাব স্পষ্ট ও উপলব্ধি করা যায়, যেমন কেমিক্যাল দ্বারা তৈরি ওষুধের প্রভাব। এ জাতীয় চিকিৎসা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ। কারণ, এ চিকিৎসা গ্রহণ করার অর্থ আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া, তিনি এতে কিছু গুণাগুণ রেখেছেন, যখন ইচ্ছা তা বাতিল করতে

---

[1] সহি ইবনে হিব্বান: (১৩৯১), আস-সুনানুস সাগির লিল-বায়হাকি: (৪৩২৪), হাকিম: (৪/৪০৭)

পারেন, যেমন ইব্রাহিম ‘আলাইহিস সালামের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নির দাহন ক্রিয়া বাতিল করেছিলেন।

পক্ষান্তরে তাবিজ-কবচ ও অন্যান্য জড়-বস্তু শরীরে ঝুলানোর ফলে কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না, গবেষণার দ্বারা তার ক্রিয়া প্রমাণিত হয়নি এবং কুরআন-হাদিসে তার স্বীকৃতি নেই। যেমন ভাত খেলে খিদে নিবারণ হয়, কিন্তু পেটের উপর ভাত রেখে খিদে নিবারণের আশা করা মিথ্যা। শরয়ী ঝাড়-ফুঁক ও ওষুধের চিকিৎসা ভাত খাওয়ার ন্যায়, আর তাবিজের চিকিৎসা পেটের উপর ভাত রেখে খিদে নিবারণের চেষ্টা করার ন্যায়।

তাবিজ-কবচ ও এ জাতীয় জড়-বস্তুকে আল্লাহ তা‘আলা রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তির উপায় করেননি, আবার তার উপকারিতা মানুষের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত নয়। বাহ্যিকভাবে তার প্রভাব দেখা যায় না, অনুভবও করা যায় না। তাই অনেকে বলেন, এসব বস্তুর ওপর ভরসা করার অর্থ মুশরিকদের ন্যায় মৃত ব্যক্তি ও মূর্তির ওপর ভরসা করা; যা শুনে না-দেখে না, উপকার বা অপকারের ক্ষমতা রাখে না, অথচ তারা ভাবে এগুলো তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, অথবা তাদের থেকে অকল্যাণ প্রতিহত করবে।

সমাপ্ত

কেন আমি কুরআনুল কারিম হিফয করব?

আমি কুরআনুল কারিম হিফয করব, কারণ আমি আল্লাহর পরিবার ভুক্ত ও বিশেষ ব্যক্তি হতে চাই।

আমি কুরআনুল কারিম হিফয করব, কারণ যে অন্তর কুরআন ধারণ করবে সে অন্তরকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন না।

আমি কুরআনুল কারিম হিফয করব, যেন কিয়ামতের দিন কুরআন আমার সুপারিশকারী হয়।

আমি কুরআনুল কারিম হিফয করব, যেন কিয়ামতের দিন আমার পিতা-মাতাকে সম্মানের টুপি পরিধান করানো হয়।

আমি কুরআনুল কারিম হিফয করব, যেন জান্নাতের সর্বোচ্চ শিখরে আমি পৌঁছতে পারি।

আমি কুরআনুল কারিম হিফয করব, যেন কুরআন আমার প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধক হয়।

আমি কুরআনুল কারিম হিফয করব, যেন আমার কিয়ামুল লাইল করা সহজ হয়।

আমি কুরআনুল কারিম হিফয করব, যেন আমি আল্লাহর অধিক স্মরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি।